অস্ফুট স্মৃতির সুর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

অস্ফুট স্মৃতির সুর ভাসি' আসে বাতায়নে মোর ;
আনীল নয়নে তব স্বপ্ন জাগে তা'র।
কত না প্রভাত-সন্ধ্যা তা'রি বন্ধ-সুগন্ধ-বিভোর—
কত মধ্যদিনে বাজে উদাসী সেতার !

তুমি এসেছিলে কবে, লঘুপদে—চটুল, চঞ্চল,—
আতাম্র আম্রের বনে মুগ্ধা বাসন্তিকা !
কত সুর-শিহরণ কত দূর, মূর্চ্ছনা-উচ্ছল—
সদ্যঃস্ফুট বকুলের সুস্নিগ্ধ মালিকা !

আজিকে হেনার গন্ধে পথ-বায়ু হ'য়েছে উতল ;
শুভ্র বন-ফুলে-ফুলে ছেয়েছে কানন,
তেমনি আসিবে সখি, দু'টি আঁখি আনন্দ-উজ্জ্বল,
—তেমনি ব্যাকুল হিয়া, স্তব্ধ আলিঙ্গন !

এ তনু-বাঁশরী মোর ভরি' তুলি নিত্য নব গানে ;
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিয়া মূর্ত্তি ধরে সুর।
চিবুক, ললাট, ওষ্ঠ ভঙ্গে ভঙ্গে সুষমার ধ্যানে
গড়িছে তোমারি কায়া—স্বপ্নভারাতুর !

〈আজিকে শিরায় মোর বহি' যায় রুধির স্থরার,
অধরের পাত্রে চির চুম্বন-পিয়াস !
কায়া খুঁজে ফিরে গান—সুর চাহে তনুর আগার।
তনুতীর্থা, মর্ম্মে জাগে অসীম তিয়াস !〉

তুমি কি বাঁশরী মোর—অথবা সে রাগিণী-নির্ঝর
মন-বন-ছায়ে-ছায়ে ফিরো একাকিনী ?
পরুষ পুরুষ কাঁদে, কাঁদি ফিরে কুসুম-কেশর ;
ভাবি তুমি নৃত্যশীলা চিত্ত-বিহারিণী !

ছায়াপথ

শ্রীপান্নালাল অধিকারী

বল্‌লা থেকে টাঙ্গাইলে ফির্‌ছি। ক'দিন বৃষ্টি হওয়াতে পথঘাটে গাড়ী চলে না, অথচ খালবিলেও নৌকা চলবার মতো জল হয় নি। পাল্‌কী চেপে চলেছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বিদ্‌ঘুটে পথ, তবু রাত্রের মধ্যে ফিরতেই হবে। দু'ধারে পাটের ক্ষেত, তারি আল্ ধরে পাল্‌কী বেয়ারারা হুঁই হাঁই—পায়ে খালি—বাঁয় সরকন ইত্যাদি নানারকম বুলি আওড়াতে আওড়াতে চলেছে। মাঝে মাঝে পাল্‌কী চেপেই ছোট ছোট নদী নালা পার হচ্ছি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের পর ছোট ছোট দু'একটা গ্রাম,—গ্রামের পথে ঢুকতেই কুকুরগুলো তারস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ছে।

একটা হাটের ভেতর পালকী রেখে বাহকেরা একটু বিশ্রাম করে নিলে। আবার সুরু করবার আগে বলে দিলে,—কর্ত্তা, একটু হুঁশিয়ার থাক্‌বেন, মাঠটার বড় দুর্ণাম আছে। হঠাৎ সাম্‌নে কোন ছায়া দেখ্‌লে, বা খস্‌খস্ শব্দ শুন্‌লে ভড়্‌কাবেন না।

চলে আর বলে—জয় মা কালী, জয় মা কালী। ক্ষেতের ভিতর দিয়ে একটা দলছাড়া শেয়াল খস্‌খস্ করে চলে গেল,—হাত দিয়ে দেখি কপালটা বেশ একটু ঘেমে উঠেছে। তারপর একটা খাড়াপাড় নদী পার হচ্ছি—পাড়ের ওপর একটা প্রাচীন বটগাছ, তলাটাতে ঘুটঘুটি অন্ধকার—একঝাঁক বাদুড় শপ্‌শপ্ করে উড়ে গেল। পালকীর দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, আকাশে কালপুরুষ তার ছোরাটা বাগিয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। চোখ বুজলাম,—তবুও দেখি কালপুরুষ আমায় পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—স্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে আস্‌ছে।

বেয়ারাদের ডাক্‌বার চেষ্টা করলাম, কথা বেরুলো না। ভালো করে দেখ্‌তে দেখ্‌লাম বেয়ারারা নেই, পালকী ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে নেমে চলেছে। পতনের বেগে চোখের সাম্‌নে থেকে পৃথিবীর স্বরূপ মুছে এল, চারদিক থেকে পুঞ্জ

পুঞ্জ অন্ধকার সীমাহীন আবেষ্টনে আমাকে গ্রাস করে ফেল্‌ল।

ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমক ভাঙ্‌ল। মস্ত একটা গেট, তারি সাম্‌নে লাল চেলী পড়া একজন লোক দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে দেখি, আরে, এ যে আমাদেরই টোলের বিদ্যারত্ন মশাই, ওঁরই মেয়ের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, বাপের অমতে হয় নি। তিনি বল্লেন,—কেও, প্রমথ? যাও ভেতরে যাও, কোন ভয় নেই। সঙ্গে কোন বইটই থাকে ত রেখে যাও। হাঁ, মধু গোয়ালার বোন্‌টি কেমন আছে বল্‌তে পারো?

বল্‌লুম, ভালো আছে, একটি ছেলে হয়েছে।

খান কত প্রেমের উপন্যাস ছিল, রেখে দিলেন।

ভেতরে ঢুকে শুধোই, জায়গাটার নাম কি? কেউ বলে না, মুখ চাওয়া চাওয়ি করে আর হাসে। বলে,—শুন্‌লে মন খারাপ হবে। অথচ লোকগুলো আমোদেই আছে মনে হল। শুন্‌লুম এ নরক। এই নরক! এ তো খাসা জায়গা। ঢের ভালো আমাদের সেকেলে মর্ত্ত্যের চেয়ে। অনেক চেনা বন্ধুর সাথে দেখা হল। এখানে সবাই সোজা করে কথা কয়, যখন তখন বেপরোয়া হাসে, বিদ্যারত্নের শাস্ত্রীয় কথাগুলোরও মানে বোঝা যায়। মেয়েরাও ঘুম না পেলে হাই তোলে না, যাকে ভালোবেসে চায় তাকে বলে না—আমি তোমার ছোট বোন্‌টি। খাসা জায়গা!

একদিন শনিবারে জোর গানের ধুম চলেছে। স্বর্গ থেকে কার্ত্তিক-প্রমুখ অল্প বয়সী দেবতারা এসেছেন। চড়া সুরে দ্রুত লয়ে একটা সেঁইয়া পেঁইয়া গোছের গান ধরেছি, শেষ হতে সবাই বাহবা দিলেন। কার্ত্তিক আমার পিঠ চাপড়ে বল্‌লেন,—বহুৎ আচ্ছা। কেস্ থেকে একটা সিগ্‌রেট বার করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—এ জিনিষটা স্বর্গে চলেছে নাকি? হেসে বল্লেন,—অনেক কিছুই চলেছে। অল্প ক'দিন হল ক'জন সতী লক্ষী বাঈজি স্বর্গে এসেছেন। আমি বল্লুম,—তাহলে স্বর্গে এখন বেশ গান বাজনার মুজ্‌রো হচ্ছে? তিনি বল্লেন,—না হে, তাঁরাও স্বর্গে এসে লজ্জাশীলা হয়েছেন, তুমি যে রকম গান গাইলে, এ সব তাঁরা ছেড়েছেন। কোরাসে কীর্ত্তন চলছে, "শেষের সেদিন মন কর রে স্মরণ"; এতে গুণীর আসরে বাঈজি হিসেবেও এদের আর কদর নেই, এবং বৃধ-মণ্ডলেও সতীপনার আদর পান না। প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। একটু হাল্কা সুর হলেই ভরত মুনি বল্‌বেন, ছেলেদের নৈতিক অবনতি হবে। অথচ, বুঝলে ভায়া, সেদিন ইন্দ্রের বাগানবাড়ীতে উর্ব্বশী দেবভাষায় যে গান গেয়েছিলেন, তার বাংলা অর্থ শুন্‌লে তিন দিন তোমার ঘুম হবে না। সেখানে কিন্তু বুড়োকর্ত্তারা সবাই ছিলেন। লুকিয়ে আমিও শুনেছি ভাই। যাবে স্বর্গে? কিছু দিন থাক্‌বে আমার ওখানে, তবু ক'দিন আরামে কাট্‌বে। আমি বল্‌লুম,—যাব।

কার্ত্তিক বল্‌লেন,—তা হলে আর দেরী নয়, চল, মোটর তৈরী, সাড়ে ন'টার পার্ফরম্যান্সে বরুণের বোন আর তার এক বন্ধুকে বায়োস্কোপে নিয়ে যেতে হবে। তাদের সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

রোল্‌স্ স্পোর্টিং টু সীটার লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আর গ্রহ-রাজির ভেতর দিয়ে ছায়াপথ ধরে ছুটে চল্‌ল।

৯-১৫ মিনিটে সিনেমার সামনে এসে গাড়ী থাম্‌ল। কার্ত্তিক আলাপ করিয়ে দিলেন। বরুণা মেয়েটির চমৎকার স্নিগ্ধ কোমল প্রেমভারাবনত দুটি চোখ, পিঠের ওপর এলায়িত নিবিড় ঘন মেঘের মত কাল চুল—বংশের ধারা পেয়েছে। তার সঙ্গিনী—আরে, এ যে আমারি পাশের বাড়ীর বিদ্যারত্ন মশায়ের মেয়ে গিরিবালা! তাকে দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম। কার্ত্তিক জিজ্ঞেস করলেন,—কি হে, আগের চেনা নাকি? বেশ হয়েছে, চলো ভিতরে যাই। তোমরা দুজনে এক জায়গায় বোসো, আমরা স্বর্গের বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা জরুরী আলাপ সেরে নিই। কিছু মনে কোর না ভাই।

কার্ত্তিক সরে যেতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম,—গিরিবালা, কি পুণ্যে তুমি স্বর্গে? সে বল্‌লে,—বিয়ের পর স্বামীকে যেমন ভালোবাস্‌তুম তেম্‌নি ভালোবাস্‌তুম বিয়ের আগে আর একজনকে। আমি বল্‌লুম,—আমিও ঐ অপরাধে নরকে। গিরি হেসে বলল,—মেয়েদের আইন ছেলেদের খাটে না।

অন্ধকার করে দিয়ে ছবি সুরু হয়েছে। গিরিবালা

আস্তে বল্‌লে,—চল বাইরে গিয়ে দু প্লেট হিমানী খাওয়া যাক্‌। আমি বল্‌লুম,—হঠাৎ আলো জ্বল্‌লে, আমাদের না দেখে কার্ত্তিক কি মনে করবে? সে বল্‌লে,—কোন ভয় নেই, আলো জ্বালার পনের মিনিট আগে ঘণ্টা দেয়। আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম,—সে কি ব্যবস্থা?

ততক্ষণে বাইরে এসেছি। গিরিবালা বল্লে,—ও সব বড়-ঘরের বড় কথা। সে এক কাণ্ড হয়েছিল। একদিন বৃহস্পতি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে হরিশ্চন্দ্র ফিল্‌ম দেখতে এসেছেন, ছাত্রদের ভারতবর্ষীয় সর্প সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবেন। আচ্‌মকা আলো জ্বল্‌তেই দেখেন সাম্‌নের সীটে তাঁরই যুবতী স্ত্রীর এবং চন্দ্রদেবের ঠোঁটজোড়া বেজায় রকম কাছাকাছি। বুড়ো ত রেগে আগুন। গাল-মন্দ অভিসম্পাত কল্লেন। তার পর থেকে আইন হয়েছে, আলো জ্বালার পনর মিনিট আগে ঘণ্টা দেওয়া হবে, দেবতারা তারি মধ্যে চোখে মুখে স্বর্গীয় ভাব টেনে ঠিকঠাক হয়ে বস্‌বেন।

আমি বললুম,—চল এবার ভেতরে যাই। সে বল্‌ল,—না, চল এখান থেকে পালাই, স্বর্গ জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়।

—কেন?

—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর সিদ্ধিদাতা গণেশ ছাড়া আর সব ক'টাই যখন তখন ফ্লার্ট কর্ত্তে চায়।

—তাতে ত তোমার কোন দিন আপত্তি ছিল না, প্রেম জিনিষটা ত তোমার বরাবর প্রিয় ছিল।

—এখানে সেটা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক।

—কি রকম?

—মর্ত্ত্যে তবু মনের মানুষকেই ভালোবাসে, এখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে সবাই সবাইকে চায়।

—কোথায় যাবে?

—চলো নিজেদের দেশে ফিরে যাই।

কার্ত্তিকের গাড়ীটায় ষ্টার্ট দিয়ে বেড়িয়ে পড়লুম। তখন মর্ত্ত্য থেকে তেত্রিশ কোটি মাইল দূরে, একটা প্রকাণ্ড বকুল গাছের নীচে এসে গাড়ী থেমে গেল, পেট্রোল নেই।

সে বল্‌লে,—এসো গাড়ীতেই শুয়ে থাকি। একটা স্প্রীং টিপ্‌তে ধব্‌ধবে বিছানা বেরিয়ে পড়ল। জ্যোৎস্নার লহর তুলে নিদ্রাহারা শশী তখন স্বপন-পারাবার পাড়ি দিচ্ছেন। বকুল গাছ থেকে মাথার ওপর অবিশ্রান্ত টুপ্‌টাপ্‌ পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রেমিক বকুল তার কোমল আস্তরণে আমাদের দুজনকে ঢেকে দিল।

—গিরিবালা!

—কি?

—আজ আমাদের ফুলশয্যা।

—আমার খোঁপার কাঁটাটা খুলে বালিশের নীচে রেখে দাও।—আহা—আস্তে—লাগে যে!

—গিরি!

—কেন?

—পাঞ্জাবীর পকেট থেকে আমার সিগারেট কেসটা দাও।

—ঘুম পাচ্ছে, তুমি নিজেই নাও।

—গিরিবালা!

—হুঁ—উ …

"কর্ত্তা আইছি—অহন নামেন।"

ডাক-পিওন

বড় গল্প

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট পাহাড়টি দূর হইতে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে আঁকা।

এবং তাহার গা ঘেঁসিয়া শালের একটি সুবৃহৎ বন-রেখা দক্ষিণে ও বামে কত দূর যে চলিয়া গেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চোখের দৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

পাহাড়ের নীচে পাথরের একটি মন্দির। কে যে ইহার প্রতিষ্ঠাতা তাহার ইতিহাস যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা মরিয়াছেন। এখন যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলেন, 'বিশ্বকর্ম্মার তৈরী।' ··· বলেন, 'মানুষের হাত ইহাতে নাই।'

বাহিরের লোকের বিশ্বাস করিতে একটুখানি বাধে।

কিন্তু পিয়ারনুটি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে এই মন্দির সংক্রান্ত কত গল্প, কত কাহিনী! বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

গ্রামখানি মন্দির হইতে রসি-খানেক্ দূরে—সমতল প্রান্তরের উপর, ঠিক যেন পটে-আঁকা একখানি ছবি।

মন্দিরের পূজারী জয়রাম আচার্য্য অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া ফুল তুলিয়া আনে, তাহার পর কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা-তিলক কাটিয়া মন্দিরে পূজা করিতে যায়।

মন্দির-চত্বরের খানিকটা অংশ এখনও অসমাপ্ত।

জয়রাম বলে, 'কোকিল ডাকলো, চারিদিক ফর্সা হয়ে গেল, বিশ্বকর্ম্মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, নইলে রাতারাতি ওটুকুও শেষ হয়ে যেতো।'

সহজ সরল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত তাহার সে গ্রাম্য মুখখানি দেখিলে মনে হয়—এ যেন তাহার চোখে-দেখা।

কেহ বিশ্বাস না করিলে তাহার রাগ হয়; কপালের রুক্ষ চামড়া কুঞ্চিত হইয়া ওঠে। বলে, 'ভগবান দেখেছ? বাবা বিশ্বনাথকে দেখেছ কেউ স্বচক্ষে?' বলিয়া মন্দিরের দিকে হাতখানি তাহার তুলিয়া ধরে।

—'তবে?'

'বিশ্বাস কর কেন, শুনি?'

বলিতে বলিতে হাসে। হাসিতে হাসিতে গোলপানা মুখখানি তাহার কি অপরূপ ভঙ্গীতেই যে নড়িতে থাকে—স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা আর বুঝাইবার উপায় নাই।

পূজা শেষ করিতে জয়রামের দেরি হয়। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করিয়া শিলানির্ম্মিত বিশ্বনাথের সুমুখে চোখ বুজিয়া জয়রাম অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর বাহিরের সূর্য্যালোক মন্দিরের দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া যখন বিশ্বনাথের গায়ে আসিয়া লাগে তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়; দরজার শিকলটি টানিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে।

ছোট একটি পুকুরের ঘাট হইতে ঢালু একটা অপ্রশস্ত পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহার বাড়ীর সুমুখ দিয়া পার হইয়া গেছে। জয়রাম আজও লক্ষ্য করিল, পুকুর হইতে ক্রমাগত জল গড়াইয়া আসিয়া ঢালু সে পথের উপর প্রচুর কাদা জমিয়াছে। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। শুচিবায়ুগ্রস্ত বৌ তাহার সেই কোন্ অতি প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিয়া পুকুরের ঘাটে গিয়া নামে, এবং এই এত বেলা পর্য্যন্ত দুই হাত দিয়া পুকুরের জল অবিশ্রান্ত ভাবে ডাঙ্গায় তুলিতে থাকে। স্নান করিয়া অশুচি পথের ধুলা মাড়াইয়া বাড়ী ফিরিলে আবার পাছে তাহাকে অপবিত্র হইতে হয়—পথটাকে জলে ধুইয়া শুচি করিবার জন্য তাই তাহার এ অক্লান্ত উদ্যম।

রাগে দুঃখে জয়রাম সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সেই পথের উপরেই কয়েকটা খড়ো ঘরের বাঁকে দূর হইতে কাহাদের যেন প্রবল কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া

যাইতেছিল। এবার তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শুনিল, তাহারই স্ত্রী যেন কাহাদের উদ্দেশ করিয়া নিতান্ত অসংযত অশ্লীল ভাষায় প্রাণপণে চীৎকার করিয়া গালাগালি করিতেছে।

কয়েক পা আগাইয়া গিয়া দেখিল, সত্যই তাই। জয়রামকে দেখিবামাত্র পাড়ার কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে এদিক-ওদিক ছুটিয়া পলাইল। দেখিল, বৌ তাহার এতক্ষণে পুকুরের ঘাট হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। পরিধানে একটা থাট কাপড়, তাও আবার নিঙ্‌ড়াইবার অবসর হয় নাই, মাথার চুল দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, শীর্ণা কঙ্কালসার, না আছে স্বাস্থ্য না আছে শ্রী;—মেয়েটা মাত্র আড়াই বছরের, হতভাগী সেটাকেও সঙ্গে আনিতে ভুলে নাই এবং তাহাকেও পুকুরের জলে বেশ করিয়া চুবাইয়া হাতের একটা নোলায় ধরিয়া, মাটিতে না ঠেকে এম্‌নি ভাবে আল্‌গোছে তুলিয়া কেমন যেন রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে।

স্বামীকে দেখিয়া বৌ একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া মাথার ঘোমটাটা টানিতে গেল, কিন্তু থাটো কাপড় মাথা পর্য্যন্ত উঠিল না। বলিল, 'আমার দোষ অম্‌নি দিলেই হয় না। দ্যাখো এবার কার দোষ! আবাগীর বেটাবেটিদের কাণ্ড-কারখানা দেখ একবার বড় বড় চোখ দুটো নিয়ে।'

জয়রাম দেখিল কিনা কে জানে, নীরু-বৌ ব্যাপারটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে লাগিল।—'জল দিয়ে ধুলে কি হবে, পথের কি আর জাত-জন্ম আছে! চান্ করতে আসবার সময় একটি আঁচল-ভর্ত্তি শুক্‌নো ঘুঁটে নিয়ে এলাম—এম্‌নি ডাগর ডাগর ঘুঁটে। পথের ওপর কত কষ্টে একটি একটি করে' পেতে রেখে—গেলাম নাইতে। বলি, নেয়ে উঠে ওর ওপর পা দিয়ে দিয়ে আসব। তা দেখ না, তুমি স্বচক্ষেই দেখ না, কেমন সব দুষমনি করলে আমার ওপর এইখান থেকে এক সারি ঘুঁটে উঠিয়ে,—দিয়েছে হতভাগীর ছেলেরা কোন্ দিকে ফেলে। ... ফেলে দিয়ে আবার মজা দেখছেন, হাসছেন ফি ফি করে',—আ মর্! এখন আমি করি কি?'

ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ হইতে আল্‌গোছে তোলা ছিল, এইবার তাহার বাবাকে দেখিয়া হাতের যন্ত্রণায় চেঁচাইতে লাগিল।

বৌ বলিল, 'ইনি হয়েছেন আমার আর এক দুষমন। বাপ যে দু দণ্ড নিয়ে থাকবে—তা না। ... ওগো, যাও তুমি আনো ঝপ্ করে' গোটাকতক ঘুঁটে এনে দাও; মরুক্‌গে তোমার পায়ে পড়ি।'

নিতান্ত ভালমানুষের মত জয়রাম তাহাই করিল। মুখে একটি কথাও বলিল না; বাড়ী হইতে শুক্‌নো এক বোঝা ঘুঁটে আনিল, তাহার পর একটি একটি করিয়া পথের উপর তাহাই পাতিয়া দিয়া, দেবীপ্রতিমা যেমন করিয়া ঘরে আনে তাহার এই সহধর্ম্মিণীটিকেও ঠিক তেমনি করিয়াই সে ঘরে লইয়া গেল।

কিন্তু বাড়ী গিয়াও রক্ষা নাই।

জয়রাম বলিল, 'দাঁড়িয়ে রইবে ভিজে কাপড়ে?'

নীরু-বৌ বলিল, 'নেয়ে এসে ঘরে ঢুকব?'—ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উহুঁ, তুমি এনে দাও। কিন্তু দেখো, গঙ্গাজল ছিটিয়ে এনো। ... আর দ্যাখ! তোমার নিজের ও কাপড়টায় ঠেকিয়ো না যেন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়রাম তার কাপড় আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিল। বলিল, 'ছি ছি, এ আমার বাড়ী না অরণ্য... ছি, ছি!'

কথাটা সে বলিল চুপি-চুপি, কিন্তু যে শুনিবার সে শুনিল ঠিক।

মেয়েটাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও মা গো! অরণ্যি কিসের? অরণ্যিতে বাস তুমি না করলেই পার।'

কাপড়টা তাহার গায়ের উপর আল্‌গোছে ছুঁড়িয়া দিয়া জয়রাম কেমন যেন একটা হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, —'হা ভগবান!'

বৌ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কাপড়টা হাতে-হাতে লুফিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছিটিয়েছ ত' গঙ্গাজল বেশ ভাল করে'?'

কি যেন বলিবার জন্য জয়রাম অনেকক্ষণ হইতে

নিশ্‌পিস্‌ করিতেছিল। সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, 'মারের চোটে তোমার ও রোগ আমি একদিন ঘুচিয়ে দেব দেখো।'

রোগের কথাটা শুনিবামাত্র নীরু-বৌ যেন ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল। কাপড় তাহার আর পরা হইল না। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, 'রোগ! ও মা গো,—রোগ কিসের? আচার-বিচের করে' শুদ্ধু শান্ত হয়ে থাকতে চাই, তাও হলো রোগ? ··· কি বল্‌লে? মারের চোটে বিষ নামাবে? কেন? কি করেছি কী? কই মারো দেখি, নাও মারো! এসো পিঠ পেতে দিয়েছি।'

বলিয়া সরোষে সে তাহার পিঠ পাতিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'দেখবি?' বলিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া জয়রাম ঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল। চেহারা দেখিয়া মনে হইল হয়ত সে তাহাকে আজ সত্যই প্রহার করিবে, কিন্তু তাহার সে সিক্ত বস্ত্র ভেদ করিয়া পাঁজরার কঙ্কালের উপর দৃষ্টি পড়িতেই জয়রামের সে উদ্যত হাতখানা আর পিঠের উপর পড়িল না, যেমন গিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া আসিয়া আপন মনেই কি যেন সব বলিতে বলিতে নিজের উপর দারুণ অভিমানে কান্নার মত মুখখানা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

মন্দিরের পূজারী তাহারা বহুদিনের। জয়রাম বলে, আচার্য্য উপাধি নাকি রাজার দেওয়া। এককালে বাবা বিশ্বনাথের জমিজমা ছিল প্রচুর, গাজনের দিনে পাহাড়তলি ঘিরিয়া প্রকাণ্ড একটা মেলা বসিত।

মেলা এখনও বসে, জমিজমাও যে নাই তাহা নয়, কিন্তু আয়ের প্রাচুর্য্য কমিয়া গেছে। কাজেই মন্দিরের পূজা ছাড়া জয়রামকে আরও কিছু করিতে হয়। কাজ না করিলে দিন চলে না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পূজারী জয়রামকে আর যেন সে-জয়রাম বলিয়া চেনা দায়। খালি পা, খালি গা, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ,—ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে ছোট একটি আম-বাগানের মধ্যে নিতান্ত ছোট একটি পোষ্টাপিস। পোষ্টমাষ্টার বিদেশী; ডাক-পিওন—জয়রাম।

শুধু পিয়ারসুটি গ্রামে নয়, আশ-পাশের আরও প্রায় দশবারখানা গ্রমের চিঠি বিলি করিয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা হয়।

নীরু-বৌ দিব্য সহজ কণ্ঠেই কথা বলে।—'নামাও, ও চামড়ার থলিটে বাইরে নামাও আগে,—তারপর ঘরে ঢুকো। বামুনের ঘর—পুজোরী মানুষ, আচার-বিচের একটু কোরো। যাও—চান্‌ করে' এসো।'

জয়রাম তাহার মুখের পানে মুখ তুলিয়া একবার তাকায়।

একবার হাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দাঁতগুলি মাত্র বাহির হয়, হাসি হয় না।

বৌ বলিতে থাকে, 'কাপড়ের আঁচলে ছুনিয়া যায় আর তোমার ছুটো চিঠি যায় না?'

এমনি প্রতিদিন ···

জয়রাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে।—তিন খানা বেয়ারিং, চারটে মণি-অর্ডার; একটা পাঁচ, একটা পনর, একটা পঁচিশ, আর একটা তিন। তিন টাকার মণি-অর্ডারটি বিলি হয় নাই। কুঞ্জ বাউরি আসামের চা-বাগান হইতে টাকা-তিনটি তাহার বৌ এর নামে পাঠাইয়াছে, বৌ তাহার ইতিমধ্যে আর একটা লোকের সঙ্গে কোথায় উধাও হইয়া গেছে; সুতরাং টাকা তিনটি আবার আসামেই ফিরিয়া যাইবে।

আঙ্গুল গণিয়া জয়রাম হিসাব করে। কিন্তু হিসাব যেন কিছুতেই আর মিলিতে চায় না।—'ঝক্‌মারি কাজ বাবা! চোদ্দ বছরে চোদ্দটা আখর্‌ পেটে ঢুক্‌লো না।'

—ক্রমশ

আমি কেন নীরব

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কিছু দিন থেকে বাংলা সাহিত্যের আসরে যে তর্ক উঠেছে সে তর্কে আমি যে কেন যোগ দিই নি, সে বিষয়ে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্ন করা আর পাঁচ জনের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত আমি সাহিত্যিক না হই, বাংলা সাহিত্যিক। দ্বিতীয়ত আমি ঘোর তার্কিক। অতএব দেশে যখন সাহিত্য নিয়ে তর্ক বেধেছে—তখন আমার মত লোকের নীরব থাক্‌বার কারণ আমার বন্ধু-বান্ধবরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে আমার পক্ষে এ ক্ষেত্রে অন্তত নারদ নারদ বলাও কর্ত্তব্য ছিল।

যদি কেউ মনে করেন যে, এ ক্ষেত্রে আমি ভয়ে কথা কই নি, তা হলে স্বীকার করি যে তাঁর সে অনুমান অসঙ্গত নয়। তর্ক আমি ভালবাসি কিন্তু দাঙ্গাকে ভয় করি। বাক্ যে অনেক সময় বিতণ্ডায় পরিণত হয়—তার পরিচয় মানুষে আবহমানকাল পেয়ে আস্‌ছে। যা সুরু হয় তর্কে, তাই অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিতণ্ডায় পরিণত হয়। আর যখন তা হয় তখন কোনও সমস্যা আর মীমাংসার দিকে এক পদও অগ্রসর হয় না। কারণ সমস্যাটাকে মীমাংসা হিসেবে ধরে নিয়েই বিতণ্ডা জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ যখন নিজের নিজের মতকে চূড়ান্ত মীমাংসা হিসাবে ধরে নেন্—তখনই তর্কের হয় শেষ আর ঝগড়ার হয় আরম্ভ। কারণ যার মনে কোনও সন্দেহ নেই তার মন জড়পদার্থের মত নিরেট, এবং জড়পদার্থের মতই কঠিন।

আমি যে তার্কিক—তার কারণ আমার মনে নানারকম সন্দেহ আছে। যখনই দেখতে পাই যে, এক দলের লোক পলিটিক্যাল, ইকনমিক, সামাজিক ইত্যাদি কোনও বিষয়ে চরম মীমাংসা করে বসে আছেন তখনই বলতে বাধ্য হই যে, তোমরা যাকে মীমাংসা বলছ তা একটি মহা-সমস্যা। পৃথিবীতে যে দলের লোককে man of action, ভাষান্তরে কর্ম্মী বলে, তাদেরই মনে কোনও সন্দেহ নেই—আছে শুধু অটল বিশ্বাস—নিজের মতের উপর, কারণ তারা কিছু না জেনে সব জানে। তাদের ও বিদ্যা এক রকম সাংসারিক পরাবিদ্যা অর্থাৎ তর্কের বাইরে। কিন্তু আমার মত অকর্ম্মণ্য লোকের মনে নানারকম সন্দেহ কিলবিল করতে বাধ্য।

(২)

আমি আর এক কারণে এ তর্কে যোগ দিতে ইতস্তত করেছি। এ লড়াই বেধেছে তরুণে তরুণে, নবীনে প্রবীণে নয়। উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই যে এ ক্ষেত্রে raw recruits সম্প্রতি তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি। এ যুদ্ধে যোগ দেবার আমার অধিকার নেই। সাহিত্যিক হিসেবে আমি কাঁচা হতে পারি কিন্তু বয়সে আমি কচি নই। সুতরাং এ যুদ্ধে আমাকে দলে টানলে কোন পক্ষেরই বলবৃদ্ধি হবে না। ইউরোপের যুদ্ধ-শাস্ত্রে পড়েছি যে তরুণ সৈনিকের দল তেড়ে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষা করে পশ্চাৎপদ হতে পারে না, ও অবস্থায় মার খাওয়ায় অভ্যস্ত পুরোণো সৈনিকের দল তাদের আগলে নিয়ে পিছু হটায়, নচেৎ নাকি attack-এর পরই তরুণের দল হয় শুয়ে পড়ে, না হয় ছড়িভঙ্গ হয়ে যায়। আমি যদি কোন দলে যোগ দেই তাহলে বেগতিক দেখলেই তাদের পিছু ডাক দেব। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে attack-এও বাধা দেব। বিশেষত শূন্যে তলোয়ার ঘোরানোতে পদে পদে তাদের নিরুৎসাহ করব। কারণ তাতে নিজেদেরই হাত পা কাটবার ভয় আছে। এ অবস্থায় আলগা থাকাই শ্রেয়।

আসল কথা, এ বাক্-বিতণ্ডার ফলে আমার বিশ্বাস সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ সাহিত্য যে কি হওয়া উচিত তা আগে থাক্‌তে ঠিক করে কেউ অতীতে

সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, ও ভবিষ্যতেও সম্ভবত পারবেন না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সদর্পে বলেছিলেন—

রচিব মধুচক্র
গৌরজন যাহে আনন্দে করিবে পান,
সুধা নিরবধি।

তিনি যে মধুচক্র রচনা করেছেন—তার প্রসাদে গৌরজন অদ্যাবধি সুধাপান করছেন কি না বলতে পারি নে। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক, আর গৌরজন উক্ত চক্রেরই মৌমাছি হয়েছেন, তাহলে তার কারণ তিনি মধুচক্র রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং যথার্থই তা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ উপাদান দিয়ে তিনি ও চাক্‌ বানাবেন—তা তিনি বলেন নি। সে বিষয়ে তাঁর যদি কোনও থিওরি থাকত তাহলে তিনি যা বানাতেন তা হত মোম, মধু নয়।

৩

সাহিত্য কি রূপ হওয়া উচিত সে বিষয়টা সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে বাজে বিচার, যেমন এ বিশ্ব কি রকম হওয়া উচিত ছিল সে বিচারটা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বাজে বিচার। ও জাতীয় ঔচিত্য জ্ঞান থেকে সাহিত্য উদ্ভূত হয় না। তা ছাড়া সাহিত্য-সৃষ্টির কোনও natural laws নেই। অন্তত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মতে যে তা নেই—তার প্রমাণ, তাঁরা বলতেন ও বস্তু নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। ঐ জন্যই ত আমরা আগে তার নিয়মগুলি শিখে নিয়ে সেই নিয়ম অনুসারে সাহিত্য গড়তে পারি নে। এই ত গেল লেখকের কথা।

অপর পক্ষে পাঠকও সাহিত্য ফরমায়েস দেন না। অলেখক হয় গোপালের মত সুবোধ ছেলে—অর্থাৎ সে যা পায় তাই পড়ে—আর না হয় রাখালের মত অবোধ ছেলে,—কিছুই পড়ে না। পাঠক গোপালও সাহিত্যের থিওরির ধার ধারে না, অপাঠক রাখালও থিওরির ধার ধারে না।

অবশ্য একদল পরোপকারী লোক আছেন যারা গোপালকে নিত্য পরামর্শ দেন যে, তার কি পড়া উচিত, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, গোপালকে এ পরামর্শ দেওয়া তেমনি বৃথা, যেমন বৃথা রাখালকে পরামর্শ দেওয়া তার কি লেখা উচিত।

কাব্য কি হওয়া উচিত সে ভাবনা বৃথা; কিন্তু কাব্য বস্তু কি, এ প্রশ্ন অবশ্য জিজ্ঞাস্য। কিন্তু এই প্রশ্ন সেই জাতের লোকের মনে উদয় হয়—যাদের মনে পৃথিবীর সকল বিষয়েরই কি এবং কেন জানার প্রবৃত্তি আছে। এ শ্রেণীর লোককে আমরা ফিলজফার বলি। এবং এঁদের এ সব বিষয়ে আলোচনা যে মানুষে শোনে, তার কারণ প্রতি মানুষের অন্তরেই একটি করে ফিলজফার আছে। তা যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট ছেলের মুখে, তারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করে 'ওটা কি'?' 'এটা কেন?' তারপর আমাদের মুখে এ সব প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর শুনে শুনে এবং মাঝে মাঝে ধমক খেয়ে তাদের মনে জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি চেপে যায়। আর যে দু'চার জনের যায় না, তাঁরা নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরেই খোঁজেন এবং তাঁদেরই নাম ফিলজফার। যে প্রবৃত্তির বলে আমরা সাহিত্যের কর্ত্তা অথবা ভোক্তা হই—এ প্রবৃত্তি সে প্রবৃত্তি নয়। সাহিত্যের আলোচনা সাহিত্যের ফিলজফিতেই সহজে গড়িয়ে যায় বলে এ কথাটার উল্লেখ করলুম। কাব্য বস্তু কি, আর দাশরথী রায়ের পাঁচালি সাহিত্য কি না, এ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ফিলজফারের কাছে, দ্বিতীয়ের আর্টিষ্টের কাছে।

৪

দার্শনিক আলোচনা আমি অত্যন্ত ভালবাসি, করতে না হোক—শুনতে। সে আলোচনা প্রথমত শ্রুতিমধুর, কেন না তা করা হয় ধীরভাবে—বীরভাবে নয়। দ্বিতীয়ত সে তর্কের অন্তরে তাপ নেই, আছে শুধু আলো। অবশ্য কারও কারও মতে ও তর্কের প্রসাদে যা পাওয়া যায় তা আলো নয়—ধোঁয়া। এর কারণ আলো ও ধূম উভয়ই এক গুণে সমধর্ম্মী, ও দুটির একটিকেও হাত দিয়ে চেপে ধরা যায় না। যা মুঠোর ভিতর পাওয়া যায় না, তাই যে ঝুঁটো এই যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁদের তর্ক অবশ্য হাতাহাতির মৌখিক সংস্করণ।

এই সব কারণে সন্দেহ হয় যে, সাহিত্য নিয়ে আজ কাল যে তর্ক সুরু হয়েছে তা দার্শনিক নয়, কারণ তার ভিতর যতটা উত্তাপ আছে ততটা আলোক নেই।

কাব্যস্রষ্টার পক্ষে এ তর্ক অবশ্য সম্পূর্ণ নিরর্থক। অপর পক্ষে কাব্যদ্রষ্টার পক্ষে হয় ত এর সার্থকতা থাকলেও থাক্‌তে পারে। কাব্য সম্বন্ধে দার্শনিক মতামত কবির বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ কাব্য থেকে কাব্য-জিজ্ঞাসায় উঠতে হয়, কিন্তু সে জিজ্ঞাসার মীমাংসা থেকে কাব্যে নামা যায় না। তা যদি যেত ত গ্রীসে আরিষ্টটেল সব চাইতে বড় কবি হতেন—আর জর্ম্মাণীতে হেগেল।

বর্ত্তমানে ইউরোপে কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে দেশে আজকের দিনে যাঁরা বড় সাহিত্যিক বলে গণ্য তাঁদের প্রত্যেকের পকেটেই একটা না একটা সামাজিক ফিলজফি আছে। তাঁরা শুধু নব-সাহিত্যের স্রষ্টা নন, তাঁরা নব-সমাজও গড়তে চান—পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে। ফিলজফির পূর্ব্বেই সামাজিক বিশেষণ জুড়ে দিলুম এই জন্য যে, বর্ত্তমানে সে দেশে সামাজিক ছাড়া অপর কোনও ফিলজফি নেই। তাই ইউরোপের যে সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, যথা—Tolstoi, Wells, Bernard Shaw, Ibsen, Strindberg—এঁরা সকলেই সমাজ-তন্ত্রের মন্ত্রদাতা তান্ত্রিক গুরু। এখন এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে হিসেবে তাঁরা গুরু, সে হিসেবে তাঁরা অকবি আর যে হিসেবে তাঁরা কবি সে হিসেবে অ-গুরু।

৫

এখন এঁদের রচিত সাহিত্যের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমার কথা একেবারে নিরর্থক নয়। Ibsen-এর ফিলজফির সারমর্ম্ম এই যে, স্ত্রী-জাতিকে পুরুষ জাতির দাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ অপর পক্ষে Strindberg-এর ফিলজফির সারমর্ম্ম এই যে, পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির দাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ।

এ দুটি ফিলজফির ভিতর কোন্‌টি ভুল কোন্‌টি ঠিক তা বিচার করা সাহিত্য-সমালোচনার কাজ নয়। আমরা এই মাত্র বলতে পারি যে, এ দুটি মত যখন ঠিক উল্টো উল্টো তখন ওর কোনটিই তাঁদের কাব্যের বীজ নয় অথবা ও দুটিই সমান কাব্যের বীজ।

এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, হয় কবির সামাজিক মতামতের সঙ্গে তাঁর কবিত্ব শক্তির কোনই সম্বন্ধ নেই আর না হয় ত যাঁর কবিত্ব শক্তি আছে তিনি যে কোনও মতের উপর তাঁর কাব্য রচনা করতে পারেন, অর্থাৎ কাব্যে মতামতের মূল্য অতি সামান্য।

টলষ্টয়কে এ দেশে অনেকে ঋষি বলে মনে করেন। তিনি নাকি ভগবান বুদ্ধের রাশিয়ান অবতার। সম্ভবত এ কথা সত্য কিন্তু কবি টলষ্টয় এবং ঋষি টলষ্টয় দুজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। War and Peace-এর রচয়িতা এক, আর Confessionএর লেখক আর। টলষ্টয় কাব্যে গুরুগিরি করেন নি, এবং উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য কাব্য নয়। তিনি একজন চরম আর্টিষ্ট; কিন্তু তিনি What is Art নামক যে বই লিখেছেন সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড রসিকতা। কারণ এ কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, উক্ত গ্রন্থের মতামতে তিনি বিশ্বাস করতেন।

অপর পক্ষে Wells এবং Bernard Shaw যা লিখেছেন, তা socialism হতে পারে অথবা anarchism হতে পারে কিন্তু কাব্য কি না সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। পৃথিবীতে যত রকম ism আছে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সে হচ্ছে আলাদা তর্ক। আসল কথা কাব্য হচ্ছে সকল ism-এর অতিরিক্ত, কারণ কোন ism-ই সম্পূর্ণ human নয়। সব ism হচ্ছে মানুষের জীবন-যাত্রার একটা হিসেব মাত্র। কাব্যের কারবার মানুষ নিয়ে—তার সাংসারিক হিসেব কিতেব নিয়ে নয়। Bernard Shaw-র বাক-চাতুরি ও Wells-এর বাক-বিস্তারের আমি চিরকালই তারিফ করে এসেছি, কিন্তু একের নাটক আর অপরের নভেল সাহিত্য কি না তা আজও স্থির করতে পারি নি।

৬

ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যের ঘাড়ে যখন নানারূপ ism ভর করেছে তখন আমাদের সাহিত্যকেও ism থেকে মুক্ত রাখা অতি কঠিন। প্রথমত আমাদের সঙ্গে কোন সাহিত্যের যদি পরিচয় থাকে ত সে এ যুগের ইউরোপীয় সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যই আমাদের আদর্শ। বিলেতি কাপড় পরে যেমন আমরা দেহের নগ্নতা লুকিয়ে রাখি—বিলেতি মতামত দিয়েও আমরা তেমনি মনের নগ্নতা ঢেকে রাখি। আমাদের পলিটিক্‌সের নব-মতামত ত সব ম্যাঞ্চেষ্টারে বোনা—আর সাহিত্যিক মতামত আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, ও ল্যাপলাণ্ড থেকে আমদানী করি। এ দুজাতের মতামতের ভিতর এই যা প্রভেদ। তারপর ism নিয়ে নাড়াচাড়া করা অতি সহজ। ওর জন্য কিঞ্চিৎ বিদ্যাবুদ্ধি ও মানুষের প্রতি কিঞ্চিৎ মায়া দয়াই যথেষ্ট। ism-এর উপর কাব্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবি-প্রতিভার কোনই আবশ্যক নেই। আর Imperialism অথবা Socialism, Militarism অথবা Pacifism, Feminism অথবা Leninism—এ সবের ভিতর কোন্‌টা জিওনকাঠি আর কোন্‌টা মরণকাঠি এবং সেই হিসেবে কোন্‌টা গ্রাহ্য ও কোন্‌টা ত্যাজ্য, তা নির্ভর করে লোকের মেজাজের উপর।

এ সব বিষয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে, অন্তত দায়ে পড়ে, কারণ ও সব হচ্ছে মানব জাতির মরণ-বাঁচনের কথা, এবং এ নিয়ে আমাদেরও দেদার মাথা ঘামাতে হবে। কারণ আমরাও জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই। আর, যে কোন একটা ism-কে অবলম্বন করা যখন আমরা জীবন-সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় মনে করি তখন আমরা তা প্রচার করতেও বাধ্য। ism-এর যুগপৎ প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ এই যে, তা জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা। কলের পুতুলে দম দিয়ে দিলে সে যেমন অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে একদিকে সোজাভাবে তেড়ে চলে—তেমনি এক একটা ism-এর বশবর্ত্তী হলে আমরা ডাইনে বাঁয়ে না ফিরে একটা পথ ধরে সোজা তেড়ে চলতে পারি—এই হচ্ছে ism-এর মহাগুণ। অপর পক্ষে ism-এর বশবর্ত্তী হলে আমরা কলের পুতুল হয়ে পড়ি, তখন আর মানুষ থাকি নে, এই হচ্ছে ism-এর প্রধান দোষ।

আর সাহিত্যের কারবার মানুষ নিয়ে, কলের পুতুল নিয়ে নয়। সুতরাং বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যের উপর ভাল কি না, সে বিষয়েও আমার মনে সন্দেহ আছে। লোকে বলে আমরা মানুষ নই। দ্বিজেন্দ্রলালও স্পষ্টই বলেছেন যে, "আবার তোরা মানুষ হ।" এবং দেশের লোকও তাই হতে চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় মানুষ না হতেই কলের পুতুল হয়ে পড়াটা কি দুঃখের বিষয় নয়? আমার বিশ্বাস মানুষকে মানুষ করে তোলবার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যের কলের চাপ থেকে আমরা তখনই বেরিয়ে যাব যখন আমরা ধরতে পারব যে, সে সাহিত্যের কোন্ অংশ poetry এবং কোন্ অংশ no-poetry. সে বিচার এখন ইউরোপই করছে, সুতরাং তাদের কাছ থেকেই তা আমরা শিখতে পারব। আমাদের বিলেতি সাহিত্য-গুরুরা যখন নতুন বুলি কপচাচ্ছেন তখন তা ইউরোপে পুরোনো হয়ে গেলেই আমাদের কাছে নূতন হবে। মনোজগতে ইউরোপের ছাড়া-কাপড় পরাই আমাদের কপালের লেখা।

৭

ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের যে social philosophy-র কথা বলেছি তা হচ্ছে আসলে moral philosophy. Bernard Shaw, Wells, Ibsen, Strindberg প্রভৃতি ঘোর moralist. এঁরা সবাই clergy man-এর স্বজাত। তবে যে লোকে তাঁদের immoralist বলে, তার কারণ তাঁরা যে morality প্রচার করেছেন সে হচ্ছে new-morality. এঁরা যে পুরোনো copy-book morality-র বিরুদ্ধে, তার কারণ তাঁরা চান যে, ভবিষ্যতের copy-book morality হবে তাঁদের morality. টলষ্টয় ত ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে ঋষি হয়ে গেছেন এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে Bernard Shaw-ও তাই হবেন। এবং বোধ হয় মানবজাতি এই new-morality-র প্রসাদে স্বর্গলাভ করবে।

সাহিত্যকে এই morality-র মাপকাঠিতে যাচাই করা নীতি-প্রাণ লোকদের চিরকেলে অভ্যেস। এবং এ বিচার শান্ত ভাবে লোকে করতে পারে না, কারণ কোন যুদ্ধই non-violent ভাবে মানুষে করতে পারে না।

যে দল পূর্ব্ব-morality-র পক্ষ আর যে দল উত্তর-morality-র পক্ষ, এই দুই দলে বাগযুদ্ধ বাধবেই। আর তখন এ বকাবকির অন্তরে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, প্রভৃতি সব রসই থাকবে,—থাকবে না শুধু শান্ত রস—আর এ উভয় দলই যদি তরুণ হন, তাহলে বকাবকি হাতাহাতিতে পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মত স্বল্পপ্রাণ সাহিত্যিকরা চুপ করে থাকতে বাধ্য। কারণ আমরা যাই বলি, এ ঝগড়া আমরা থামাতে পারব না। এ তর্ক বহুকাল থেকে চলে আসছে আর ভবিষ্যতেও চলবে। কারণ যার থেকে এ তর্ক উদ্ভূত হয় তাও মানবের একটা সনাতন মনোভাব।

সাহিত্যিক হিসেবে এ দলাদলিতে আমরা যোগ দিতে অপারগ, কেননা এ মনোভাব থেকে সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। "দুয়ে দুয়ে চার হয়" এমন কথা বললে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, কথাটা moral কি immoral, তা হলে সে প্রশ্নের কি কোনও উত্তর আছে? পুরোনো morality-র উপাদান নিয়ে অতীতে মহাকাব্য রচিত হয়েছে এবং সম্ভবত নূতন morality-র উপাদান নিয়েও ভবিষ্যতে মহাকাব্য রচিত হবে, যদি সে নূতন morality পুরোনোর যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু এ সব তর্ক তখনই থামবে যখন লোকে উপলব্ধি করবে যে, science এবং art হচ্ছে beyond good and evil. আর যতদিন সে সত্য লোকে গ্রাহ্য না করবে ততদিন মানুষে moral এবং immoral লেখাকে কাব্য বলে চালাতে চেষ্টা করবে আর সমালোচকেরা তা অচল করবার চেষ্টা করবে।

কাকজ্যোৎস্না

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সে এক দিন এসেছিল; তার পর এক দিন সে চলে' গেছে। শুধু সেই একটি সুর।

সেই একটি সুর-ই অমলের সকল কর্ম্মে ও অবকাশে গুঞ্জন করে' ফেরে। শেষ-রাতের শিথিল শীতল হাওয়া দক্ষিণের খোলা জান্‌লা দিয়ে ঘরের মধ্যে বইতে থাকে, অমল মশারি সরিয়ে জান্‌লা দিয়ে পাত্‌লা, অস্ফুট অন্ধকার দেখে। অনেক রাত পর্য্যন্ত না ঘুমিয়ে পাশের ঘরের রুগ্ন দেববাবুর মাথায় হাওয়া করে' এসে আর ঘুম হয় নি। উদাসীন আসন্ন প্রভাতে শুয়ে শুয়ে একটি মন্থর আলস্য উপভোগ করতে ওর ভারি ভালো লাগে,—কিছুই মনে পড়ে না,—শুধু সে একদিন এসেছিল! একেবারে চলে' হয় ত' সে যায় নি।

গট্ গট্ করতে করতে বীরু এসে ঘরে ঢুকে' ঠেলা মেরে বলে—উঠুন অমলবাবু, আজ বাজার করবার পালা আপনার। দয়া করে' একটু চট্‌পট্ সেরে' আসবেন। আপিসে ন'টার মধ্যে হাজিরা চাই আজ।

অমল উঠে' পড়ে। দেয়ালে রেবার ফটোর সঙ্গে সামান্য একটু দেখা হয়। রেবা যেন একটি বহুদিনবিস্মৃত ম্লান হাসি হেসে' ওকে সসঙ্কোচে সম্বোধন করে,—কাল বহুক্ষণ রাত জাগার দরুণ ওকে একান্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে বলে' যেন একটু সহানুভূতি জানায়। ও মনে মনে সেই ফটোর উদ্দেশে নমস্কার করে।

তার পর সেই একঘেয়েমি,—একান্ত মামুলি। বাজার,

স্নান, খাওয়া,—আপিস্; তার পর সেই ক্লান্তি ও বিশ্রাম। কিন্তু অমলের কাছে আর কিছুই অর্থহীন নয়। সমস্ত পরিশ্রম ও অবসাদের মধ্যে একটি অতুল তৃপ্তির স্বাদ।

আপিস্ থেকে ফের্‌বার সময় মাঝে মাঝে মাঠে বসে' জিরিয়ে নেয়,—আকাশের মতো নিজেকে এক সঙ্গে শূন্য ও পূর্ণ বলে' অনুভব করে। যে বিধাতাকে জীবনে কোনোদিন স্বীকার কর্‌বার প্রয়োজন হয় নি, তাকেই মনে মনে সৃষ্টি করে। কি অদ্ভুত মিল রেবার সঙ্গে! সুদূর সান্ত্বনার মতো আকাশের তারাগুলি ঈষৎ কম্পিত হ'তে থাকে।

বিয়ের আগে হঠাৎ একদিন রেবার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। বলেছিল—তুমি চিরকাল আমার মনে দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে—

অমল বলেছিল—কি এসে যায় তাতে? ও কথাটা এত গর্ব্বভরে বল্‌বার কিছু দরকার নেই।

রেবা অমলের দু'টো হাত চেপে' ধরেছিল বুঝি। বলেছিল—তুমি আমায় ভুল বুঝো না।

অমল কঠিন হ'য়ে বলেছিল—ঠিকই তোমাকে বুঝেছি। নারীকে এর চেয়ে বেশি আর কি বোঝা যায়?

রেবা প্রণাম কর্‌তে নীচু হয়েছিল। অমল বলেছিল—দূরে থেকে প্রণাম কর। দেবতাকে ছুঁতে নেই।

সেদিন রেবার প্রতি মন অপরিসীম অশ্রদ্ধায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছিল বলে' আজ সুকোমল সন্ধ্যালোকে অমল একটি অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করে। রেবাকে পায় নি,—সে যেন ওর একটা পরম ঐশ্বর্য্য! ওর দুই চোখে ও নীল আকাশে রেবা যে একটি অকূল কান্নার সমুদ্র দুলিয়ে দিয়ে গেছে তার জন্য ও রেবাকে মনে মনে ধন্যবাদ দেয়।

অমল নিজের নিভৃত অন্তরলোকে একটি রূপকথার মায়াপুরী রচনা করেছে। বিরহদীপালোকিত কল্পনা-স্বর্গ,—তাতে অন্ধকারের নদী আনন্দাশ্রু হ'য়ে তরঙ্গিত হ'য়ে উঠেছে, সমস্ত ব্যর্থতা একটি সার্থক সম্পূর্ণ শতদলে যেন গৌরব লাভ করেছে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন একটি উদ্ধায়িত প্রার্থনার মতো কম্পিত হ'য়ে উঠেছে। সে এসেছিল বলে'ই ত' তার চলে' যাওয়ার এত সুমধুর অর্থ! ভাগিস্, সে ওকে ফেলে চলে' গেছে,—তাই ত' অমাবস্যার অন্ধকারে এত মায়া, নির্জ্জন মুহূর্ত্তে নক্ষত্র-লোক হ'তে এই ব্যাকুল ইঙ্গিত! জীবনে কি আশা মেটে নি, অমল তা' নিজেকে একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না।

হঠাৎ অমল একদিন ওর ব্যাগ্‌টা নিয়ে মেস্ থেকে বা'র হ'য়ে গেল। কে একজন সারা ছ' মাস একটা চাকুরির জন্য টো টো করে' টহল দিয়েও কিছুই করতে পারে নি, তাকেই চাকুরিটা দিয়ে অমল বেরিয়ে পড়্‌ল। চাকুরি করে'ই সারা জীবনের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাতে হবে, এমন কিছু বিশ্বজনীন বিধি নেই। গ্রামে যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু জমি আছে তাতেই ওর দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হবে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্য ওর সমস্ত মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। জীবনে যেন একটি দুর্ব্বার খরস্রোত এসেছে।

দিদি অমলকে হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—কত দিন তোকে দেখি নি, বল্ ত'! হঠাৎ দিদিকে মনে পড়্‌ল, দিদির এত সৌভাগ্য কিসে?

অমল বল্লে—বল্‌তে গেলে সৌভাগ্য ত' আমার। নদীর পারে তোমার বাড়িটি কি অপরূপ, দিদিমণি!

দোতলার ছাতে একখানা মাত্র ছোট ঘর ছিল, তাতেই অমলের জায়গা হ'ল। পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে শীর্ণকায় মৃতপ্রায় নদীটিকে দেখে ওর খালি রেবার শিশিরতরল দু'টি কালো চোখ মনে পড়ে। যেন একটি মমতাময়ী কল্যাণী বোন্,—একটি সস্নেহ শুশ্রূষা বহন করে' চলেছে। মাঝে মাঝে দু' একটা সরু শাল্‌তি ভেসে' আসে, জল কম থাকলে কখনো কখনো গরুর গাড়ী চড়ে' পারাপার হয়। ওপারে দূরে শ্যামল বন,—শীর্ণ শুভ্র বঙ্কিম পথরেখা দেখা যায়। অমল জানালায় বসে' বসে' নদীটির মৃদুগুঞ্জন শোনে। তৃতীয়া-চাঁদের অস্ফুট আলোটি ভীরু চুম্বনের মতো যখন নদীর জলে টল্‌টল্ করে' ওঠে, তখন ওর রেবার সেই বিদায়বেলার মুমূর্ষু চাহনিটি মনে পড়ে।

ঘরে আস্‌বাব কিছুই নেই, শুধু দেয়ালে রেবার সেই —ছবিখানি। আর সব অগোছালো;—সমস্ত জিনিস অগোছালো করে' রাখ্‌তেই ওর ভালো লাগে।

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে

নদীর দিকে চোখ না পড়ে' দক্ষিণের জানলা দিয়ে খোলা ছাতের ওপর চোখ পড়ল। কে একটি কিশোরী সকাল বেলা স্নান করে' পিঠের ওপর দীর্ঘ ভিজা চুলগুলি মেলে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে হয় ত' সকাল বেলার আধ-ঘুমন্ত নদীকেই দেখ্‌ছিল। চোখ ফিরিয়েই অমল আর ওকে দেখ্‌তে পেল না। মনে হ'ল, রেবা যেন রাত্রির অবগুণ্ঠন ফেলে দিয়ে প্রফুল্ল প্রভাতালোকে আনন্দপ্রতিমার মত নেমে এসেছে। অমল উঠে' বস্‌ল। তন্দ্রাহতা ক্ষীণা নদীটির আলস্যমন্থর লঘু গতিতে যেন সুদূর দিনের একটি বেদনা বেজে' উঠেছে। একাকিনী নদী।

কি মনে করে' হঠাৎ সেদিন অমল দিদিকে গিয়ে বল্লে—এবার যাই ?

দিদি বল্লেন—দু'দিন যেতে না যেতেই ? আপিসের ত' আর তাড়া নেই,—কোথায় যাবি শুনি ? এ কিছুতেই হ'তে পারে না। এই ছবি, তরকারিটা যেন আবার না পুড়ে' যায় দেখিস্‌।

একটি অনতিযৌবনা কিশোরী কুণ্ঠিত গতিতে রান্না-ঘরে গিয়ে ঢোকে, পরে রান্নার বিচিত্র শব্দ চল্‌তে থাকে। অমল একবার দেখেও দেখে না। মেয়েটি চকিত বনহরিণীর মত অমলের সমুখ দিয়ে চঞ্চল পদে চলে' যায় এবার।

এক হপ্তার ওপর চলে' গেল। ছবি প্রথম প্রথম অমলের সাম্‌নে নিজের অস্তিত্ব গোপন করে'ই চল্‌ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের জন্যই হয় ত' অবরোধের সেই বন্ধন একটু শিথিল হ'য়ে এল। ক্রমে লোকটির প্রতি ছবির মনে একটি অহৈতুক অথচ সাগ্রহ কৌতূহল জন্ম লাভ করল। নিরন্তর এক বাড়ীতে এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও অমল একবারো বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে' ওকে দেখ্‌ল না, এটা ছবির কাছে কতকটা যেমন আশ্চর্য্যের তেমনি অপমানেরো বটে! সমস্ত দিন কোথায় যে থাকেন কেউ জানে না, খালি রাত্রি জেগে নদীর হাওয়া খান্‌,—কোন কাজ নেই কথা নেই,—যেন একটা বোবা বাঁশির মতোই অর্থহীন। ছবির এক এক সময় ইচ্ছা হয় এই লোকটির সমস্ত নিস্তব্ধতা একটি প্রখর প্রবল হাস্যরোলে খণ্ড বিখণ্ড করে' দেয়। বলে—বসে' বসে' কবিয়ানা কর্‌বার জায়গা এটা নয়।

সেদিন সন্ধ্যার জলখাবারটা কি ছুতো করে' ছবি বুঝি ওপরে অমলের ঘরেই রাখ্‌তে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে উঠ্‌বার সময় সাড়িটা আর একটু পরিপাটি করে' নেবার চেষ্টা কর্‌লে, সাড়িটা বদ্‌লে আসাই সঙ্গত হবে কি না তাও ভাব্‌লে একবার। অমল চোখ বুজে' পড়ে' ছিল তখন। ছবি অকুণ্ঠিত স্বরেই বল্লে—খাবার এনেছি।

পাত্‌লা ঘুমের মধ্যে করুণ ও কম্প্র একটি কণ্ঠস্বর শুনে অমল ধড়্‌মড়্‌ করে' উঠে বল্লে—ও! খাবার? তা' বেশ।

আর কোনো কথা নয়,—ক্ষণেকের জন্য একটি উৎসুক কৌতূহলে পর্য্যন্ত অমল ছবিকে অভিনন্দিত করে না। খাবারের থালাটা রেখে ছবি ধীরে চলে' যায়। আবার খানিকবাদে জলের গ্লাশটা নিয়ে আসে। গ্লাশটা হাতে করে'ই দাঁড়িয়ে থাকে। মেঝেতে নামিয়ে রাখ্‌লে পরে অমল হাত বাড়িয়ে সেটা গ্রহণ করে। একটা প্রশ্ন পর্য্যন্ত করে না।

আজকাল খাবার রোজ ওপরেই আসে। একদিন হঠাৎ অমল প্রশ্ন করে' ফেল্‌ল—আমি কি পায়ের শক্তি হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি যে খাবার খেতে নীচে নাম্‌বারো ক্ষমতা নেই ?

ছবি মুচ্‌কে একটু হেসে বল্লে—কিন্তু আপনার কবিত্ব ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে।

অমল হেসে বল্লে—আমি কি খুব কবিত্ব করি নাকি ? আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় ?

ছবি বলে—আপনাকে কি মনে হয় জানি না, তবে সমস্তক্ষণ ত' নদীর দিকেই চেয়ে থাকেন।

অমল বলে—নদীর দিকে চেয়ে থাকি ? কই, জান্‌তাম না ত' সে কথা।

তারপর আর আলাপ জমে না। ছবি নীচে গিয়ে আবার জলের গ্লাশ নিয়ে আসে।

অমল বলে—এক সঙ্গে নিয়ে এলেই ত' পার, দু'বার সিঁড়ি ভাঙ্‌তে হয় না।

কথার সুরে একটু আদর পেয়ে ছবি বলে—সিঁড়ি ভাঙ্‌তে আমার একটুও কষ্ট হয় না।

সেদিন সন্ধ্যার মুখেই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে অমল

শুয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘরে কিসের একটা শব্দ হ'তেই চোখ মেলে ওর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না,—ঘরে ছবি। ও আবার চোখ বুজ্‌ল। বলয়ঝঙ্কৃত হু'টি চঞ্চল হাতে ছবি ঘরের সংস্কার করতে লেগেছে। সারাদিন সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কলহকোলাহলের মধ্যে ও যেন একটুও সময় পায় নি, তাই রাত্রির অন্ধকারে একটু নির্জ্জন অবসর খুঁজে' নিয়ে এসেছে,—রাত্রির অন্ধকারে নারীর রূপ সত্যিই কি অনির্ব্বচনীয়! অমলের খালি মনে হচ্ছিল প্রখর দিবালোকে যে রেবা একটি সুগোপন বিস্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করে' থাকে সেই রেবাই তারালোকিত অপূর্ব্ব অন্ধকারে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। একটি কথাও বলে না। নদীর অস্ফুট কলগুঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ঘরের মধ্যে ছবির চপল চারু দেহলতার চলাফেরার শব্দ শোনে।

ছবি একটি মোমবাতি জেলে মেঝের ওপর রেখে ঘর ঝাঁট্‌ দেয়, ময়লা কাপড়গুলি দিয়ে একটা বোঁচ্‌কা বাঁধে, নীচে নিয়ে যাবে যাবার সময়—শিয়রের জান্‌লাটা বন্ধ করে' দেয়। তারপর বাতিটা মুখের খুব কাছে এনে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়, তখন অমল ওর উদ্ভাসিত লজ্জারুণ মুখখানি দেখে গোপনে গোপনে একটি পরম চরিতার্থতা অনুভব করে। অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলে ছবি নীচে যায়, অমল যেন তার নিদ্রাহীন চোখ দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ওকে অনুসরণ করে।

অমলের আর রাত জাগ্‌বার কথা মনেই হয় না কোনদিন। রোজই সকাল সকাল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে আর সমস্ত হৃদয় পেতে ছবির লঘু অস্পষ্ট পদধ্বনি শোন্‌বার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গোণে। ঈপ্সিতার জন্য প্রতীক্ষা করে' থাক্‌বার অস্থিরতার মধ্যে যে একটি তীব্র আনন্দ আছে অমল নূতন করে' তা' আবার উপলব্ধি করে' রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। এক একদিন ছবি ভারি দেরি করে—অমলের ভারি অভিমান হয়, কিন্তু সে অভিমান প্রকাশ কর্‌বার মতো হেতু কোথাও খুঁজে' পায় না। একদিন ছবি বাতিটা নিবিয়ে ফেলে তখুনি না গিয়েই মশারি তুলে অমলের মুখ দেখ্‌বার জন্যই হয় ত' মুখ বাড়িয়েছিল, অমল তার গালের ওপর ঈষদুষ্ণ একটি লুব্ধ নিশ্বাস অনুভব করে' শিউরে উঠেছিল, কিন্তু চোখ পর্য্যন্ত মেল্‌তে পারে নি। ছবি তখুনিই ফের সরে' গিয়েছিল। অমলের মনে হচ্ছিল এই উৎসুক স্নেহের প্রতিদানে একটিও সাড়া না দিয়ে সে শুধু ছবিকে নয়, রেবাকেও অপমান করেছে। এক রাতে ছবি আর এলই না,—অমল সে রাত অস্থির হ'য়ে ছাতে পায়চারি করে' কাটিয়েছে, পাতার মর্ম্মরে নদীর ব্যথিত মুখরতায় ওর সব সময়েই মনে হয়েছে এই বুঝি ছবি এল, এই বুঝি দু'টি চোখ ওর মুখের কাছে ধর্‌বে। আজ রাতে ছবি আর আসে নি,—

রাতে আসে নি বটে কিন্তু সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করে' সকাল বেলায়ই ছবি এসে হাজির। মুখে মধুর একটি মালিন্য, চোখে একটি অপরূপ ক্লান্তির সঙ্গে একটি ঔদাস্য মেশা। আস্‌তেই অমল প্রশ্ন করে' বস্‌ল—কাল রাতে আসো নি যে?

প্রশ্ন শুনেই ছবির কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভ হ'য়ে উঠ্‌ল। ঢোক গিলে বল্লে—পাছে একদিন হাতে হাতে ধরা পড়ে' যাই সেই ভয় ত' আর কম নয়।

অমল বলে—সকাল বেলায়ই কি তা' কম মনে হয়?

ছবি কৌতুক বোধ করে' বল্লে—কিন্তু সকালবেলায় যে আমি আপনার কাছে পড়্‌তে এসেছি—

অমল বলে—তখনো ত' তুমি দয়া করে' ঘর গুছোতেই আস—

ছবি কথার স্রোতটা একেবারে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিলে। অমলের দিদিকে উদ্দেশ করে' বল্লে—বৌদি বল্লেন আপনার কাছে ইংরিজিটা পড়ে' নিতে। বসে' বসে' অক্লান্ত বিশ্রাম ভোগ করাটা কোনই কাজের কথা নয়,—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এর ঢের ঢের অপকারিতার উল্লেখ আছে। একটু খাটুন, —বেশি কিছু নয়, দু'টো শব্দের মানে আর তর্জ্জমা। রোজ এম্‌নি করে' করে' পড়ালে আমার দারুণ উপকার হবে।

অমল বল্লে—ধারাবাহিক ভাবে কোনো কাজ করে' যাবার মতো উৎসাহ বা অধ্যবসায় আমার কিছুই নেই—শুধু এই কুড়েমি করা ছাড়া।—

বাধা দিয়ে ছবি বল্লে—বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই হবে, আচ্ছা, দাঁড়ান্, বই নিয়ে আসি। বই কাছে থাকাটা ভালো। বলে' হেসে' চলে' গেল।

আস্‌বার সময় এক হাতে কয়েকখানি বই ও অন্য হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির। বল্লে—আপনার চা-টাও আজকাল ওপরেই হোক্। মিছিমিছি কষ্ট করে' নীচে গিয়ে কি লাভ ?

তক্তপোষের একধারে বসে' বল্লে—আচ্ছা, আজকের দিনটা না পড়্‌লে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। আজ আপনি আমাকে একটা গল্প বলুন।

অমল বিস্মিত হ'য়ে বল্লে—গল্প বল্‌ব ? কিসের গল্প ?

—যার কথা দিন রাত্রি আপ্‌নি ভাবেন—

—কার কথা ভাবি ? তা ত' আমি নিজেই জানি না।

—না, নিজে জানেন না আবার ? দেয়ালে কার ঐ ফটো ? তাঁকে কি পান্‌নি ?

অমল হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। বলে—পাবার জিনিষ হ'লে পাওয়া যেত বৈ কি ! শুধু, সামান্য পাওয়া না পাওয়া দিয়েই কি জীবনের সমস্ত সার্থকতার মূল্য হয় ?

ছবি তার প্রগাঢ় স্নেহসিক্ত নীরব দু'টি চোখে কি অপার মায়া রচনা করে কে জানে, অমল নিজেকে আর গোপন করে' রাখ্‌তে চায় না, ওর হৃদয়ের বন্দী অথচ ব্যাকুল বেদনা নির্ঝরিণীর মতো প্রবাহিত করে' দেয়।

অনেক কথাই বলে' চলে। ছবির পৃথক সত্তা সম্বন্ধে ওর আর একটি বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না, ভাবে, ওর দূরচারিণী প্রিয়া রেবা আজ বহুদিন পরে তার দুই চোখে অনির্ব্বচনীয় একটি মমতা বহন করে' ওর কুশলজিজ্ঞাসা কর্‌ছে। ছবির চাহনির অন্তরালে যেন একটি অতি-আত্মীয়তার মোহ আছে। ছবি যেন ওর অমরকালের প্রেয়সীর একটি বিশেষ অভিব্যক্তি।

প্রভাতের রৌদ্রে, নদীকলগুঞ্জনে, সন্নত আকাশের সস্নেহ নীলিমায় চারিদিক যেন অপূর্ব্ব একটি মায়া বিস্তার করে' ধরেছে। এর মধ্যে পুরুষের এই উদ্দাম অথচ সুগভীর প্রেমের পরিচয় পেয়ে ছবি বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেল। রেবার প্রতি ধিক্কারে ওর মন ভরে' উঠ্‌ল। প্রেমের এই বিপুল অজস্রতার বিনিময়ে রেবার সেই নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ছবির কাছে একান্ত অসহ্য বোধ হচ্ছিল। ছবি যেন নিজের মনে অমলের সেই বিরহব্যথার, সেই সুখস্মৃতির, সেই আনন্দানুভূতির ব্রীড়া ও শিহরণ অনুভব করে।

তারপর অমলের সমস্ত দিন একটি সুখাবেশের মধ্য দিয়ে কেটে' গেছে। ছবির কাছে ওর হৃদয়ের সমস্ত কাকুতি প্রকাশ করে' ফেলে ওর আর তৃপ্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের মধ্যে কিসের একটা কুণ্ঠা সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ভাব্‌ছিল,—যে ওর একান্ত এক্‌লার, যে বেদনাই ওর জীবনের একমাত্র বিত্ত, তাকে এত অনায়াসে লোকচক্ষুর সাম্‌নে খুলে' দেওয়াতে তার মহিমা পরিম্লান হ'য়ে গেছে। এ বেদনা ত' ওর সামান্য একটা বিলাসবস্তু নয়,—এ যে ওর গভীরতম, তীক্ষ্ণতম, পরমতৃপ্তিকর অনুভূতি !

আরো অনেক কথাই ভাব্‌ছিল। ভাব্‌ছিল,—ইদানী ও ছবিকে বড্ড বেশি আমোল দিচ্ছে। এ অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত অনুচিত। অমল আজ নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করে' শোবে। দরজা বন্ধ থাক্‌লেও মলিন জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট নদীধ্বনিতে আতুর বাতাসে যে ওর ঘরে আস্‌তে পার্‌বে—তার নাম রেবা, ছবি নয়।

অমল দরজা বন্ধ করে'ই শুল, কিন্তু কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। কখন্ সিঁড়িতে ছবির পদশব্দ শোনা যাবে, কান খাড়া করে' তারই প্রতীক্ষা করে' রইল। রেবার স্মৃতি অস্পষ্টতর করে' দিয়ে ছবির সেই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যথাতুর সুশীতল দু'টি চোখই খালি ওর মন আচ্ছন্ন করে' দিচ্ছিল। আরো অনেক কথাই,—ছবির চলা, বসা, কথা কওয়া, —ও কিছুতেই ছবিকে মন থেকে মুছে' ফেল্‌তে পার্‌ছিল না।

ছবি দরজায় ঠেলা দিয়ে দেখ্‌লে, দরজা বন্ধ। কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না, আবার ঠেলা দিল। এবারো খুল্‌লো না। ছবি তারপর দরজায় বার কতক করাঘাত কর্‌ল।

ঘরের মধ্যে অমল সজাগ ও চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। একবার ইচ্ছা হ'ল উঠে' দরজা খুলে' দু'টি হাত ধরে' ছবিকে ঘরে নিয়ে আসে, অন্ধকারে ওর সঙ্গে বহু কথা কয়, সমস্ত নিস্তব্ধ হৃদয়ে দিয়ে ওকে অনুভব করে। কিন্তু, না।—

অমল নিজেকে প্রাণপণ বেগে নিষ্ঠুর দৃঢ়তার সঙ্গে সংযত করে' রাখ্‌ল।

ছবি একবার অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে ডাকুলে—অমলবাবু! দরজা খুলুন্‌।

অমলের মন অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল, ভাব্‌ল,—ছবির নিশ্চয়ই কিছু গোপন কথা আছে ওর কাছে, তাই রাতের অন্ধকারে বল্‌তে এসেছে। কিন্তু দরজা কিছুতেই খুল্‌ল না।

ছবি আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করে' নীচে নেমে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে' কেঁদে ফেল্‌লে। আজ অমলের অতৃপ্ত প্রেমের দুঃখই ওর কাছে বড় হ'য়ে দেখা দিল না, নিজের ভাগ্যে যে অযাচিত প্রত্যাখ্যান যে নিষ্ঠুর অপমান ছিল তারই বেদনা একান্ত মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে। আজো হৃদয়ে কত কামনাই করে' নিয়ে গিয়েছিল, কত কথা বল্‌বে বলে' ঠিক করেছিল, তাই আজ যেতে ও অনেক রাত করেছে,—অন্ধকার গাঢ় না হ'লে সেই সব কথা বল্‌তে মোটেই সাহস হয় না,—আজই ওর ভাগ্যে এই নিদারুণ প্রত্যাখ্যান!

আরো কয়েক দিন কাট্‌ল। এ কয়দিন ছবি আর অমলের সস্নেহ দৃষ্টির অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায় নি, ওর চতুর্দ্দিকে একটি ম্লান অভিমান বিরাজ করেছে। অমল আজকাল নীচে গিয়েই চা ও জলখাবার খেয়ে আসে, ঘর তেম্‌নি অগোছাল করে'ই রাখে,—আর যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ ছবিরই ম্লান পাণ্ডুর সুন্দর মুখখানা ধ্যান করে, নিজেকে কেন জানি আর খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় না। তাই আজকাল রাত্রে ছবি আর না এলেও দরজা খুলেই রাখে। ছবি আসবে না জেনেও ওর পদশব্দের প্রত্যাশায় জেগে থাকার মধ্যে একটি সুগোপন সুখ আবিষ্কার করে' শিহরিত হয়।

একদিন কথায় কথায় দিদি বলে' ফেল্লেন—ছবিকে তোর কেমন লাগে অমল?

অমল উৎসাহিত হ'য়ে জবাব দিলে—বেশ মেয়ে। তবে বোধ হয় একটু অবাধ্য।

দিদি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—ওকে তুই বিয়ে কর্‌বি?

অমল বল্লে—পাগল নাকি?

—কেন? ও কি তোর যোগ্য নয় বলে' ভাবিস্‌? চমৎকার মেয়ে।

—বরং আমিই ওর যোগ্য নই দিদিমণি। আমাদের কপালে লক্ষ্মী নেই,—লক্ষ্মীর বাহন।

—কক্‌খনো না। তুই একটিবার কথা দে অমল,—আমি মেয়েটার কান্না থামাই।

অমল ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—তার মানে?

—মেয়েটা রাত্রে কাঁদে,—তোরই জন্য নিশ্চয়। তুই হয় ত ওকে ব্যথা দিয়েছিস্‌—

অমল এক সঙ্গে গর্ব্ব ও করুণা অনুভব করে। কোনো নারীকে ও একটি তুচ্ছতম আঘাতও দিতে পার্‌ল, এতে ওর অহঙ্কার বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণে ছবির ক্লিষ্ট দু'টি স্বপ্নভারাতুর দৃষ্টি কল্পনা করে' ওর মন আর্দ্র হ'য়ে আসে। কিন্তু কঠিন হ'য়েই বলে—বিয়ে আমি কোনো কালেই করব না। তোমার এ প্রস্তাব ফিরিয়ে নাও।

অমল ভাব্‌লে, এবারে সরে' পড়াই অত্যন্ত সঙ্গত হবে। সামান্য লোভের বশে নিজের এত বড় আদর্শকে কলঙ্কিত কর্‌তে পার্‌বে না। বিকেলের দিকে সবাইর থেকে বিদায় নেবার পালা সাঙ্গ হ'য়ে গেল,—শীতল বিষণ্ণ নদীটি অতি করুণ কণ্ঠে ওকে বিদায় জানাল, পারের ধূসর বনান্তলেখা একটি বেদনাপূর্ণ বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, —কিন্তু ছবিকে কোথাও খুঁজে' পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে ছাতে এসে অমল দেখ্‌লে এক কোণে ছবি মুখে আঁচল ঢেকে বসে' আছে। অমল একটি পরম বিস্ময় অনুভব কর্‌লে। ডাকুলে—ছবি! আমি যাচ্ছি।

ছবি মুখের মধ্যে কাপড় পুরে' উদ্গত ক্রন্দন রোধ করছিল হয় ত। খানিক বাদে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে—আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

নারীর মুখে এই সাহসবাণী শুনে অমল পরম পুলকে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কারো কাছ থেকে নিষ্ঠুর অবহেলা পেয়ে, স্নেহলাভে ব্যর্থ হয়ে পৃথিবীতে কোনো নারী অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে পারে,—অমলের কাছে এ একটা সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা! আজ নিজের চোখে একটি ব্যথিতা অশ্রুমতী নারীর কোমল মুখের শোকম্লান অপূর্ব্ব সুন্দর

লাবণ্য দেখে অমল একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু মুখে কোন সান্ত্বনাবাণীই এল না। কাউকে চরম অপমানের দণ্ডদানের মধ্যে নিষ্ঠুরতার একটা অদম্য মাদকতা আছে; অমল কণ্ঠস্বর একটুও আর্দ্র না করে' বল্লে—একা চলে' যেতেই আমি এসেছি, তার বহন করতে পারব না।

অমল চলে' যেতে উদ্যত হ'তেই জুতোর ওপর ছবির হাতের স্পর্শ পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। ছবি ওকে প্রণাম কর্‌ল, অমল সেই প্রণামটি প্রত্যাখ্যান করতে পার্‌ল না। তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে' চলে' গেল।

ইষ্টিশানে যাবার বাকি পথটুকু অমল আকাশ পাতাল কত কথাই না ভেবেছে। মনে কোনো অহঙ্কারই স্থায়ী বাসা বাঁধ্‌তে পারছিল না, কেবল ছবির মুখচ্ছবির পাণ্ডুরতা সমস্ত সান্ধ্য আকাশকে একান্ত বিবর্ণ করে' দেখাচ্ছিল। আজ বুঝতে পারছিল, রেবার চলে' যাবার মধ্যে কত বড় একটা অন্যায় ও অবিচার ছিল, ছবির ব্যর্থতার মধ্যে নিজের বেদনার প্রতিবিম্ব দেখে অমল মনে মনে একটি ভয় ও করুণা অনুভব কর্‌ছিল। ভাব্‌ছিল,—ছবিকে বিয়ে কর্‌লে কি ক্ষতি? বরং রেবার নিষ্ঠুরতার একটা সস্তা প্রতিশোধ নেওয়া হয়। জীবনে ওকে ব্যর্থ উদাসীন ও কলঙ্কিত দেখে রেবা হয় ত' নারীসুলভ একটা সহজ আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌বে, হয় ত' ওকে করুণার চোখে দেখ্‌বে,—রেবার এই আস্পর্দ্ধা অমলের কাছে নিতান্তই অসহ! অমলের জীবনে ত' নারীর প্রয়োজন আছে, স্থূলরূপেই আছে,—নারীর সেই রূপকে সে অস্বীকার কর্‌বে কি করে'? শুধু একটি স্থির অচঞ্চল বিরহস্বপ্নে ওর সমস্ত জীবন সম্পূর্ণ সত্যরূপে প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌তে পারবে না। ছবিকে নিয়ে ও একটি অনাড়ম্বর মধুর নীড় নির্ম্মাণ কর্‌বে,—ছবির প্রেমে একটি সুষমান্বিত স্বর্গ আবিষ্কার করে' ও ধন্য, কৃতার্থ হবে,—ছবি ভিখারীর মত ওর যে প্রেম যাজ্ঞা করে, সেই প্রেম ও অকাতরে অজস্রধারে ঢেলে' দেবে, ভাব্‌তে অমলের সুখের আর অবধি ছিল না।

তা ছাড়া, কোনো পুরুষ কোনো একটি বিশেষ নারীকেই ভালোবাসে না, সে একটি ছাঁদকে ভালোবাসে। নারী পুরুষের প্রেম থেকে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যলাভ করে' তার চোখের সুমুখে পুষ্পিত ও পূর্ণাবয়ব হ'য়ে ওঠে। রেবা এম্‌নি করে'ই অমলের কাছে একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব কবিসৃষ্টি ছিল। সুমধুর আত্মীয়তার রসে, পুলকিত কল্পনায় ও এমনি ছবিকে আবার সৃষ্টি করে' তুলবে। ছবির দেহে সেই রূপ আছে, যৌবন আছে, ক্ষুধা আছে, অন্তরে সেই একটি উদার বেদনা-বোধ আছে, সুকোমল সহানুভূতি আছে, সুচারু পেলবতা আছে,—আর যা নেই তা ও ওর পরমাত্মীয়ের নিকট থেকে আপন প্রেমের শক্তিতে লাভ কর্‌বে, আহরণ কর্‌বে। কোনো আদর্শেরই একটা বিশিষ্ট স্থায়ী মূর্ত্তি নেই, সমস্ত আদর্শেরই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন চলে। ছবির প্রেমেই ওর সেই শাশ্বতকালের আদর্শ পরম পরিণতি লাভ কর্‌বে।

ইষ্টিশান থেকেই অমল ফিরে' এল। কোথাও কোনরূপ খবর না দিয়ে বরাবর তেতলায় নিজের ঘরে এসে হাজির হ'ল। অন্ধকারে ভালো করে' কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একটা চাপা কান্না মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে অমলের বুকে বিঁধ্‌ছিল। হাতের ব্যাগ্‌টা মেঝের ওপর ধীরে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দ পদে এগিয়ে এসে অমল তক্তপোষের ওপর বসে'ই শোকাকুলা ছবিকে কাছে টেনে এনে বল্লে,—আমি ফিরে এসেছি, ছবি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে বল্‌ছিলে না? ওঠ,—চল।

ছবি অমলের ব্যগ্র বাহুর মধ্যে পক্ষিশাবকের মত কাঁপ্‌ছিল। হয় ত' সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্ন, তাই সাহস করে' চোখ খুল্‌তে পার্‌ছিল না, শুধু নিজের কোমল আনন্দ-কম্পিত শিথিল তনুলতা দিয়ে একটি তপ্ত ও তৃপ্তিকর স্পর্শের স্বাদ পেয়ে কৃতার্থ বোধ কর্‌ছিল। খানিক বাদে চোখ চেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে' পড়ে বল্লে—ফিরে এলেন যে বড়?

অমল বল্লে—বল্লাম যে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যাবে না?

—কিন্তু বৌদিকে খবর দিয়ে আসি গে। বলে' ছবি বা'র হয়ে যাচ্ছিল।

অমল বাধা দিয়ে বল্লে—একটু পরে যেয়ো। খানিকক্ষণ এখানে বোস'।

অন্ধকারে নদীকে ভারি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, শুধু তার অস্ফুট মৃদু নৃত্য এই দু'টি বিরহী উৎসুক পিপাসিত দেহের রক্তধারায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বুঝি। আকাশের তারা যেন তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে, দূরের বনরেখা যেন একটি

স্নেহপূর্ণ ইঙ্গিতের মত ওদের অভয় দান করছে। ওরা বসে' বসে' নিস্তব্ধ হতবাক্ হ'য়ে পরস্পরের নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনছে।

তারপর একদিন শুভলগ্নে ছবি ও অমলের বিয়ে হ'য়ে গেল। অমল কল্‌কাতায় একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করে' ছবিকে নিয়ে এল। গ্রামের দূরসম্পর্কীয়া এক পিসিমা অভিভাবিকা রূপে স্থান লাভ কর্‌লেন। দিদি যাবার সময় বলে' দিলেন,—একদিন আমাদের নেমন্তন্ন করিস্, ছবি।

ছবি পাকা গৃহিনীর মত জবাব দেয়—আমাদের ঘর অতিথি-অভ্যাগতের জন্য সদাই খোলা থাক্‌বে, বৌদি।

ছবির আনন্দ আর ধরে না। ছবি স্বামীর গোপন বেদনার ইতিহাস জানে, তাই ওর সেবা স্নেহ ও সহৃদয়তার যেন আর শেষ নেই। সব সময়ে স্বামীকে প্রফুল্ল রাখ্‌বার জন্য ওর চেষ্টা অসীম, নিজের কিছুমাত্র ত্রুটি হ'লে ওর লজ্জার আর শেষ থাকে না। ও দেহসজ্জায় বাক্‌পটুতায় গৃহকর্ম্ম-নিপুণতায় সমস্ত দিক দিয়েই স্বামীকে মুগ্ধ করে' রাখ্‌বার চেষ্টা করে। স্বামীর সম্পূর্ণ একটি অন্তরঙ্গতা লাভ কর্‌বার জন্য ওর হৃদয়ে একটি দুর্ণিবার পিপাসা পুঞ্জিত হ'য়ে উঠে।

একা বসে' বসে' অমলের আর আলস্য সম্ভোগ করা চলে না। সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ কর্‌তে হবে ভেবে ওকে একটা আপিসে ছোট খাটো একটি চাক্‌রি নিতে হয়েছে। মাইনে অতি সামান্য, কিন্তু তা দিয়েই ছবি একটি সুমধুর ও শান্তিময় সংসার পেতেছে। ঠাকুর চাকর কিছুই রাখে নি, সমস্ত দিন নিজেই সংসারের কাজ করে' যায়, আর যতটুকু অবসর পায় তা দিয়ে স্বামীর মনোরঞ্জন কর্‌তে তৎপর হয়। ছবি শুধু স্বামীকে মুগ্ধ নয়, মত্ত করে' তুলেছে। ছবির মধ্যে একটি অপার সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, একটি সুষমাময় ভাবপ্রবণতা ছিল—তা আবিষ্কার করে' অমলের আর সুখের শেষ ছিল না। ও কেবলই ভাবে, রেবা যেন এই দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থালীর মধ্যে একটি সেবাপরায়ণা দয়ার্দ্রহৃদয়া কল্যাণী নারীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' অবতীর্ণ হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে অমল ছবিকে রেবা বলে'ই ডাকে।

কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে আপিস্ থেকে শ্রান্ত হ'য়ে এসে যখন একতলার ছোট বারান্দাটিতে এসে বসে, চারধারের উদ্ধত দেয়ালের ওপর দিয়ে ছোট একটুখানি আকাশ দেখা যায়, তখন অমলের সমস্ত মন সুদূরের জন্য, না-পাওয়ার জন্য উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। একটা সীমাহীন অতৃপ্তির উত্তরঙ্গ সমুদ্র যেন বুকের মধ্যে তুমুল কান্না সুরু করে' দেয়। সংসার চালাতে ওকে চিরকাল এম্‌নি অর্থোপার্জ্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কর্‌তে হবে, একটা কঠিন বন্ধনে ওকে চিরকাল নিষ্পেষিত হ'তে হবে ভেবে ওর সমস্ত মন তিক্ত হ'য়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের সহজ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে ছবির সঙ্গে একটা সুদৃশ্য সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে হবে, ছবিকে প্রতিপদে নয়নগ্রহিনী করে' রাখ্‌তে হবে, একটা প্রকাণ্ড দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়েছে ভাব্‌তে অমলের আর বিরক্তির শেষ থাকে না।

তার চেয়ে রেবার বিরহে ও যে একটি মধুর নির্জ্জনতা ও নিঃসঙ্গতা লাভ করেছিল সেই বুঝি সহস্রগুণে ভালো ছিল। স্বচ্ছ নদীস্রোতের মত তাতে স্বাধীনতার একটা সহজ স্ফূর্ত্তি ছিল, সেই উদার দুঃখানুভূতির মধ্যে একটি প্রশান্ত বৈরাগ্য ছিল,—সেই বেদনানিষিক্ত পরমতৃপ্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অমলের সমস্ত হৃদয় অধীর, আর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নারীর নৈকট্যের মধ্যে যে একটা উন্মত্ত আনন্দ আছে তাতে ওর তৃপ্তি নেই, ও একটি সুদূর সুষমাস্বর্গের বিরহিনীকে লাভ করতে চায় অথচ যাকে কোনকালেই পাওয়া যায় না।

অমল ভাবে, ওর এই সংসাররচনা একেবারে একটা অলীক স্বপ্ন। সেই যে দিদির কাছে গিয়ে নদীস্রোতের সঙ্গে মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমা মিশিয়ে একটি অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা রচনা করেছিল,—সেই নির্জ্জনতায়ই ওর স্থান,—একটি একাকী জীবনযাপনের মধ্যে যে একটি অবারিত নিঃসঙ্গতা আছে সেই নিঃসঙ্গতাই ওর জীবনে একমাত্র আরাধনার বস্তু ছিল। সেই অনির্ব্বচনীয় বিরহের জন্য ওর মন ক্ষুধিত হ'য়ে উঠেছে। ও একান্তে বসে' বসে' শুধু আপন হৃদয়ের মধ্যে একটি অনন্ত নিস্তব্ধতা অনুভব করে।

রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে এঁটো হাতেই ছবি ছুটে' আসে,

বলে—শিগ্‌গির একটা দাও, চট্‌পট্‌। ঘোম্‌টাটা খসে' গেল—

সহসা অমলের ধ্যান ভেঙে যায়। ছবির ক্লান্ত মুখখানি ভারি সুন্দর লাগে। বলে—তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ, ছবি।

ছবি বলে—দয়া করে' তুমিও একটু দুষ্টু হও না, লক্ষ্মী ছেলে। শিগ্‌গির,—পিসিমা এক্ষুনি দেখে ফেল্‌বেন। বলে' দু'টি স্পর্শাতুর পেলব ঠোঁট অমলের মুখের কাছে নিয়ে আসে।

অমল মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে—শিগ্‌গির যাও, তোমার রান্না পুড়ে' যাবে।—

ছবি বিরস মুখে রান্না ঘরে ফিরে যায়।

সেদিন আপিস্‌ থেকে ফিরে এসে অমল এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌লে। মুখোমুখি ছবিকে পেয়ে খুব নির্দ্দয় ভাষায় তিরস্কার করলে। বল্লে—তুমি কার হুকুমে দেয়াল থেকে রেবার ফটো সরিয়েছ,—কোন্‌ অধিকারে?

ছবিও তেম্‌নি তম্বি করে' বলে—পরের বিবাহিতা স্ত্রীকে কেউ ধ্যান করবে, এ আমি সইতে পারি না। তাঁকে তোমার অপমানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে চাই।

অমল রুখে' উঠে বলে—তুমিই তাঁর মন্দিরে অনাহূত হয়ে ঢুকে তাঁকে অপমান করেছ। সেই অপমানের শোধ তোমাকে সারা জীবন ভরে'ই দিতে হবে। শিগ্‌গির ফটো টাঙিয়ে রাখ, বল্‌ছি।

ছবি কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে নিজের উদ্গত অভিমান ও ঈর্ষা রুদ্ধ করে' ফটোটা ফের টাঙায়। অমল বাজার থেকে গোড়ের মালা কিনে সেই ফটোটির পাশে পরম আদরে জড়িয়ে দেয়। বলে—তুমি কোনদিন এ সব জিনিষে হাত দিতে পারবে না। পার যদি ত' রোজ সকালবেলা উঠে এই ফটোটিকে প্রণাম ক'রো।

সেই রাতে অমলের পাশে শুয়ে ছবি খালি কেঁদেছে এবং ওর বিগলিত অশ্রুতে একটি প্রেমিক ও সবলকায় পুরুষের স্বপ্ন দেখেছে শুধু। এই কান্নার মধ্যে অতলস্পর্শ একটি ব্যর্থতা, কিন্তু অমল ওকে গ্রহণ করবে না ভেবে সেই যে প্রথম দিন কেঁদেছিল তার মধ্যে একটি আনন্দদায়ক তৃপ্তি ছিল।

ছবির কান্না দেখে অমলের মন আবার গলে' গেল বোধ হয়। ভাব্‌লে, ছবিকেও ত' ও ভালোবাসে, ওর জীবনে ছবির প্রয়োজনীয়তা ত' আর কম নয়, শুধু রেবার প্রতি ওর এই উগ্র ঈর্ষাই ত' অমলকে নিরন্তর পীড়া দেয়। অমল ছবিকে একান্ত স্নেহে কাছে টেনে বল্লে—আমাকে মাপ কর, রেবা!

ছবি রুখে' ওঠে। বলে—আমার নাম রেবা নয়, ছবি।

অমল বিদ্রূপ করে' বলে—তাই নাকি? আমি ত' ভাব্‌তাম, যে আজ আমার পাশে শুয়ে কাঁদ্‌ছে সে রেবাই, আর কেউ নয়।

ছবিকে বিছানায় একলা ফেলে অমল উঠে সেই একতলার বারান্দাটিতে এসে বসে। ভাবে, হয় ত' বিয়ে করে' রেবাও এম্‌নি একটি আয়ত্তাতীত সুদূরের জন্য একটি পরম নিষ্ফলতা বহন করছে। হয় ত' আজ রেবার মনে অমলের সেই ব্যথিত স্মৃতিটিই একান্তরূপে জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এ হয় ত' ওর একটা বিলাসস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়,—এও মনে করে। তবু, ও এই বিস্তীর্ণ অন্ধকারে মনে মনে রেবার সঙ্গে একটি পরম ঐক্য অনুভব করে। ভাবে সেই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের মধ্যে কত মধুরতা ছিল, রেবার জন্য একটি গৌরবময় বৈরাগ্য ও বেদনা বহন করবার মধ্যে কত বড় পরিতৃপ্তি ছিল,—ও তা ভুল করে' ত্যাগ করে' এল কেন? সেই নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ বিরহীজীবনের জন্য ওর মন আতুর হ'য়ে উঠেছে।

চোখের জল মুছে ছবি আবার সংসারের কাজে নামে, আবার স্বামীর চিত্তহরণ করবার চেষ্টা করে। কখনো কখনো বা একটি অনাগত শিশুর জন্য ওর অন্তরে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ লালন করে' সুখ পায়। মনে বিশ্বাস রাখে, একদিন স্বামী ক্লান্ত হ'য়ে ওরই কাছে উৎসাহের জন্য, সহানুভূতির জন্য প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াবেন,—ও সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে।—

বারান্দায় চেয়ার টেনে অমল চুপ করে' বসে' ছিল। ম্লানমুখী ছবি কাছে এসে শুধোল—ন'টা বেজে গেল, চান্‌ কর্‌তে যাবে না?

অমল বল্লে—আপিসে আজ্‌কে আর যাব না।

—শরীর ভালো নেই বুঝি ?

—না, বেশ ভালোই আছে।

ঘণ্টা খানেক বাদে ছবি আবার আসে। বলে—এখনো ঠায় বসে' আছ কেন ? চান্ করে' খেয়ে নাও।

অমল বলে—আজ্‌কে খাব না।

ছবি বলে—কেন ?

—আমার আজ্‌কে উপবাস।

ছবি হাস্‌বার ভাণ করে' বলে—হঠাৎ কি ব্রত নিলে শুনি ?

অমল ছবিকে কাছে টেনে নিয়ে আসে, ওর একখানি হাত ঘাড়ের ওপর তুলে' দেয়। পরে গাঢ়স্বরে বলে—পাঁজির এই দিনটিতে রেবা আমাকে তার ভালোবাসা জানিয়েছিল। সে প্রেমনিবেদনের মধ্যে কি প্রচুরতা ছিল তা ভাব্‌তে আজো আমার হৃদয় একটি মধুর কবিতার মতো দুলে' ওঠে। এই দিনটি আমার জীবনে পবিত্রতম দিন, ছবি ! এই দিনটিই আমার জীবনের অতুল সম্পদ্।

ছবি তার স্নেহনিবিড় দু'টি চক্ষু দিয়ে অমলের সমস্ত বেদনা যেন মুছে' নিতে চায়। নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' বসে' স্বামীর অতৃপ্ত আত্মার ব্যর্থতা অনুভব করে, নিজেকে একান্ত নিরুপায় ও অবলম্বনহীন মনে করে' স্বামীর ঘাড়ে মাথা এলিয়ে দেয়।

অমল বলে—আগে জীবনে ছোট ছোট ক্ষতি ঘট্‌লে একটা বড় ক্ষতির সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে তাদের আমোলেই আন্‌তাম না। কিন্তু জীবনে যখন পরম ক্ষতির দিন এল, তখন কে জান্‌ত সেই ক্ষতির মধ্যে এত মাধুর্য্য ছিল ! তবুও আমি ভুল কর্‌লাম, ছবি !

ছবি আরো খনিকক্ষণ বসে' থেকে ধীরে ধীরে উঠে' চলে' যায়। কতগুলি ফুল জোগাড় করে' এনে একটি মালা গাঁথ্‌তে বসে, ফটোটির গায়ে নতুন করে' জড়িয়ে দেবে। ফুলগুলির উপর শুধু কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে' পড়ে। মাঝে মাঝে অপলক চোখে ফটোটির দিকে চেয়ে থাকে আর কি ভাবে নিজেই কিছু বোঝে না।

ছায়া

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তন্দ্রা-ঘন স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে
চলেছিনু অন্যমনে শীর্ণ-পথে বন-অন্তরালে।
আঁধার-বিহঙ্গ বিদ্ধ আলোকের সোনার সায়কে
ঝাপটিছে দীর্ঘ ডানা ; স্বপ্ন-সম করিছে বিস্তার
আকাশের স্বচ্ছ কোলে আসন্ন রাত্রির কালো কেশ।
হেন কালে অকস্মাৎ নয়নের সম্মুখে আমার
পড়িল কাহার ছায়া ! ক্ষীণ কায়া, শুভ্র তা'র বেশ,
ফুটিয়াছে সন্ধ্যা-তারা অন্ধকার, সুগন্ধি অলকে,
মুখ তা'র মৃত্যু-সম ম্লান,
তটিনী তুষার হ'য়ে জমে' যায় আঁখির পলকে—
শীতল পাষাণ !

ছায়ামূর্ত্তি কাছে এলো ধীরে,
জল-স্রোত-সম এলো সুগন্ধ-তরঙ্গ মোরে ঘিরে'।
শুধালাম, 'কে গো তুমি ?' কহিল সে নিঃশ্বাসের ভাষে,
'তুমি মোরে চিনিলে না ? আমি তব অতীতের প্রিয়া,
একদিন তুমি মোরে ভালবেসেছিলে।' ক্ষণ-তরে
মৃত্যু-ম্লান মুখে তা'র মুগ্ধ চোখে রহিনু চাহিয়া ;—
মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, 'তুমি সেই ?' গাঢ়-স্নেহ-ভরে
বাঁধিতে গেলাম তা'রে তীব্র সুখে ব্যগ্র বাহুপাশে,
আনন্দের বেদনা-বিহ্বল,
স্পর্শমাত্রে সঞ্চারিল শোণিতের উত্তপ্ত উল্লাসে
তুষার শীতল !

শুধালাম, 'সত্য কহ দেখি—
সেদিন—ভুলেও কভু মোরে ভালোবাসিয়া ছিলে কি?'
'কভু নয়। অভিনয় করেছিনু শুধু।' 'অভিনয়—
তা-ও ছিলো সুমধুর, সুধাময়। আজি বুঝি আর
তা'রো প্রয়োজন নাই?' 'কিছু নাই।' 'ওগো উদাসিনি,
ভালোবাসো নাই বলে' কোনো দুঃখ নাহি কি তোমার?'
'কোনো দুঃখ নাই।' কহিলাম, 'চিনি, তোমা চিনি,
তুমি সেই প্রিয়া মোর, লভিলাম তব পরিচয়;—
তুমি মোরে ভালোবাসিয়ো না,
তোমার চরণ-প্রান্তে নিত্য তবু করিব সঞ্চয়
বাসনার সোনা।

'শুধু দাও ভালোবাসিবারে'—
এত বলি' অন্ধ নেত্রে সর্প-সম বাঁধিলাম তা'রে
নিবিড়, কঠিন আলিঙ্গনে। তারপর তিলে-তিলে
প্রতি রক্ত-কণা মোর জমে' গেল হিম-নিষ্পেষণে,
ছিন্ন হ'য়ে গেল শত শিরা। নয়নের নীলমণি
নিবে' গেল জ্যোতিঃশেষ তারকার মত। কোন্ ক্ষণে
কোথায় মিলালো স্বপ্ন-সঙ্গিনী সে ছায়াঙ্গী রমণী—
পারি নি জানিতে, হায়। আজো তবু আঁখির সলিলে
কুন্তল-সুগন্ধ স্মরি তা'র,
আজো তবু রহিয়াছে ব্যাপ্ত করি' আমার নিখিলে
কেশ-অন্ধকার।

'দেবদাস'-এর জন্মেতিহাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন পুরাদমে আমাদের সাহিত্য-সভার কাজ চলিতেছিল। মাসের প্রতি তিনটি রবিবারে সাধারণ সভ্যগণের গল্প ও কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত; এবং একটিতে সভাপতি শরৎচন্দ্রের একটি করিয়া লেখা আমরা শুনিতে পাইতাম।

এমনি করিয়া কোরেল, চন্দ্রনাথ, পাষাণ এবং দেবদাস জন্ম লাভ করিয়াছিল।

ইহার মধ্যে একদিন শরৎচন্দ্রের লেখা একখানি কাব্য আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম।

সেখানির উল্লেখ করিলে শরৎচন্দ্র আজো বিষম লজ্জিত হইয়া পড়েন; বলেন, সে-সব কাঁচা বয়সের বেয়াদপির কথা কাউকে ব'লো না; বেঁচেছি সেটা হারিয়ে গেছে, নইলে মহা-বিপদেই প'ড়তে হ'তো।

জানি না, কেন সেখানির কথা লেখককে এত লজ্জা থাকি দেয়। যতদূর মনে পড়ে, আমরা সকলে খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

এই কথা বলিলে শরৎচন্দ্র বলেন, তোমাদের মতামত নির্ভুল বিচারের স্থান পেতেই পারে না।

এ কথা স্বীকার করি যে, লেখকের সহিত প্রীতি-অপ্রীতির সঙ্গে লেখার রস-গ্রহণের খুব একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। জন-সাধারণের বিচার-বুদ্ধিটা এত কাঁচা এবং অপরিণত হয় যে, তাহাতে ব্যক্তির ব্যবহারগত প্রভাব কেমন করিয়া অতর্কিতে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত বিচারের ব্যাপারটাই ঘোলাইয়া তোলে।

হয় তো এমনি একটা বিচার-বিভ্রাট আমাদের মনে ঘটিয়াছিল; কিন্তু অপর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বারবার মনে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধেও লেখকের মতামত অনেক সময়ে এমন অদ্ভুত হয় যে, তাহাও জনসাধারণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সেইরূপ কিছু একটা যে ঘটে নাই, এমন কথাও বলা শক্ত।

কারণ কবিতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একটা অদ্ভুত ভয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের অসাধারণ প্রতিভা না থাকিলে, সে একটা কথার সহিত আর একটা কথা মিলাইতে পারে না। একদিন কাহাকে 'ক্রীড়া'র সহিত 'ব্রীড়া' মিলাইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেটি তাহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয়।

সেই জন্য এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছিল। লেখার ধরণ-ধারণ ভাব-ভঙ্গী যতদূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মত। কিন্তু বিষয়-বস্তুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শরৎ-চন্দ্রের লেখার মধ্যে উচ্ছ্বাস বড় কম। স্তব্ধ-কঠিন, বাক্য-সংযমের ভিতর দিয়া তিনি বিষয়টি এমন অপূর্ব্বভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেন—যাহা সঙ্গতি এবং যুক্তির অচল প্রতিষ্ঠায় পাঠকের মনকে একেবারে জয় করিয়া বসে।

মনে হয় ভূতের ভয়ের মত মিলের ভয় শরৎচন্দ্রের মনকে পঙ্গু না করিলে তিনি হয় ত' বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে কাব্য-কুসুমের অম্লান অঞ্জলিও রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে, গান লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে তাঁহার পক্ষে নাটক লেখা সহজ হইত। তাঁহার নাটকের জন্য গান লিখিয়া দিবার অনুরোধ বোধ করি তিনি বঙ্গের সকল প্রথিতনামা কবিকে দু একবার করিয়াছেন। ষোড়শীর গানগুলি শুনিয়াছি তাঁর নিজের রচনা নয়।

অনেক দিন আগেকার কথা, প্রায় আটাইশ বৎসর গত হইল। আসন্ন বৃষ্টির জন্য সেদিন আর বৈকালে বেড়াইতে

বাহির হই নাই; কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকিতেও ইচ্ছা যায় না। এমন সময় ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা হইতে শরৎ আসিয়া উপস্থিত। বগলে একটা ছাতা।

ভাগলপুরের বসন্ত-কাল মাছি, মশা এবং রাস্তার অপরিমিত ধূলি-বাহুল্যে ব্যাহত-সৌন্দর্য্য। নিদারুণ পশ্চিমে হাওয়ার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে মানুষ এমনি বিব্রত হইয়া পড়ে যে, কাব্যস্ফুরণের অবসর হওয়া দুর্ঘট। আম্র-মুকুলের ঘন গন্ধের সহিত অতিরিক্ত পরিমাণে ধূলি-মিশ্রিত থাকায় কবিকে তাহা উৎফুল্ল না করিয়া বিমর্ষ করে। প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে কোকিলের কুহুরব—তাপ-জর্জ্জর প্রকৃতির ব্যাধি-বিলাপের মত নিরন্তর মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

কিন্তু বর্ষার শোভা অপরিমেয়। পথগুলিতে কাদা হয় না। একটানা বৃষ্টির বড় একটা আপদ নাই। গাছ-পালা শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। তাহার উপর মেঘ-মেদুর অম্বরে গম্ভীর নির্ঘোষ—একান্ত কাব্য-রস বঞ্চিত হৃদয়কেও যেন উতলা করিয়া দেয়।

শরৎচন্দ্রের চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তায় কাব্য-অভিব্যক্তির লেশ-বিন্দু কোন কালে পাওয়া যায় না। সেকালের লোকেরা প্রেমকে যেমন মানসিক ব্যাধি বলিয়া ঠাহর করিতেন, শরৎচন্দ্র তেমনি কাব্যোচ্ছ্বাসকে চরিত্র এবং মনের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মনের গঠনটি একজন কঠিন বৈজ্ঞানিকের মত। যুক্তি-তর্ক, ইতিহাস এবং ভ্রমণ-কাহিনী—কিম্বা নিজের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার কঠিন সত্যের উপকরণে তাহা যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার একটা অসাধারণ বিশেষত্ব—জীবের প্রতি অপার করুণা।

জীবের সহিত মানুষকে গণ্য করিলে বোধ হয় ভুল হয়। গরু বাছুর কুকুর পাখীই শরৎচন্দ্রের নিকটতম আত্মীয়ের চেয়ে সমধিক প্রিয়। আত্মীয়বিয়োগের ব্যথার চেয়ে তাঁর সুপ্রিয় 'ভেলী'র মৃত্যুতে তিনি অধিক বিচলিত হইয়াছিলেন।

বোধ হয় অতর্কিতে সেদিনের প্রাবৃট সন্ধ্যার নিসর্গ তাঁর মনকে স্পর্শ করিয়াছিল—তাই দেহমনে একটা উদ্দাম পুলকের চাপল্য ছিল।

আমাদের হাসির মধ্যে এই কথার একটা চাপা ইঙ্গিত ছিল, তাই শরৎ আমাদের 'লিট্‌ল ক্লাব এসোসিয়েশনের' ছোট্ট ঘরটির ছিন্ন ফরাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া উগ্র-গন্ধের বর্ম্মা-সিগার টানিতে লাগিল।

সেই অন্ধকার ঘরটিতে আড্ডা ক্রমেই জমিয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এমন কোন বিষয় কি বস্তু রহিল না যাহার সম্বন্ধে আলোচনা হইল না; কিম্বা তাহার সপক্ষে কি বিপক্ষে আমরা একটা কঠিন মন্তব্য ঝাড়িলাম না।

গল্প শেষ দিকটায় আসিয়া আমাদের মুসাই চাকরটির অটল প্রভু-ভক্তি, মুনিবদের কাজে তার নিষ্ঠা, তার বিশ্বস্ততা ইত্যাদির উপর দাঁড়াইল।

মুসাই অদূরে তার ছোট ঘরটিতে বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং অজস্র কাশিতেছে।

আমাদের মধ্যে কে একজন বলিল, কিন্তু ও আজকাল একটু চোর হ'য়েচে …

শরৎ হাসিয়া বলিল, সে ও চিরকালই আছে। তোমরা ওর ঐ ব্যাপারটা বোঝ না; দাদামশায়ের সময় আমি ওর অনেক কান-মলা খেয়েছি, আর ওর অনেক হিসেবও লিখে দিয়েছি। … বাজার করতে গিয়ে দু'-এক পয়সা নেওয়াটাকে ও হকের সামিল মনে করে। বলে, ও নইলে আমাদের চলে কিসে? … ওর জিম্মায় কিন্তু লক্ষ টাকা রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার;—তার একটা কাণা-কড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে ও মহা অধর্ম্ম জ্ঞান করে। …

শরৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, প্রভুভক্তিতে আমি ওর চেয়ে বড় এমন লোক দেখি নি। আশ্চর্য্য! নিরক্ষর, কোন বড় শিক্ষা ও জীবনে পায় নি … আজ ষাট-সত্তর বছর ওর বয়স; আর এসেছে—সেই এতটুকু ছোঁড়া, দশ-বারর একদিনও বেশী নয়—অবাক হয়ে যাই যখন ওর কথা ভাবি! … তোমরা ওর সব কথা জান না। এই পরিবারের চার পুরুষের সেবা ও ক'রেছে। তোমাদের ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয় হালিসহরে, সে সময় কি না ও ক'রেছে তাঁর? তারপর দাদামশাই … ওকে যে কত শ্রদ্ধা করতেন—তাও

দেখেছি নিজের চোখে। ... তাঁর মৃত্যুর সময় ও শিয়রে দাঁড়িয়ে বিনা আহারে বিনা নিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়েছে। ... আর আজ বুড়ো হয়েছে—ছেলেটি মানুষ হয়ে উঠেছে—তবুও ও এ বাড়ী ছেড়ে একদিন অন্যত্র থাকতে পারে না ; ... ওর ঋণ অপরিশোধ্য।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা মৌন হইয়া রহিলাম।

শরৎ আবার বলিল, ভারি ইচ্ছে করে ওর চরিত্রটিকে একটা বইয়েতে ফুটিয়ে তুলি ...

আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলাম, বেশ তো শরৎ, তাই কর না কেন ?

সে বলিল, আচ্ছা, একমাস সময় দেও আমাকে—একমাসের পর আমি তোমাদের কাছে—মুসাই-এর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, তার পরিচয় দিতে পারবো আশা করি।

এই সংকল্প লইয়া অনেক রাত্রে সে বাড়ি চলিয়া গেল।

হয় তো একমাসের কিছু বেশী সময়ই লাগিয়াছিল কিন্তু সে নিজের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল।

এই একমাসের মধ্যে সে দিনকয়েক একান্ত উদ্বেগ এবং নিবিড় ব্যথার সহিত দিন কাটাইয়াছিল।

'কাণা' বলিয়া তাহার একটি কুকুর তাহাকে এই সময়ে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

'কাণা'র জন্য সে যে কি সুতীব্র শোক পাইয়াছিল তাহার পরিচয় 'দেবদাসের' পাণ্ডুলিপির অঙ্গে অঙ্গে লিখিত ছিল।

অনেকদিন এমন হইয়াছে যে, সে কলম ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কাণা'র কথাই ভাবিয়াছে এবং সেই সকল চিন্তার প্রোজ্জ্বল কথাগুলি খাতাখানির চতুর্দ্দিকে লিখিয়া রাখিয়াছে।

দেবদাস শুনিয়া আমাদের দল প্রায় মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের লিখন-পদ্ধতির সম্বন্ধে পরে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সেই সময়ে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলিতে হইবে বলিয়া মনে করি।

এইখানে শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, দেবদাস পুস্তকখানি যেন শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু শোণিত দিয়া লিখা।

ইহাতে কবি-কল্পনার চেয়ে জীবনের কঠিন বাস্তবকে দ্রবীভূত করিয়া সাহিত্যের ছাঁচে ঢালার কৃতিত্ব যেন অধিক দেখিতে পাই।

জীবনের বিপুল দুঃখকে অমরত্ব দান করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা—তরুণ লেখকের ব্যর্থ হয় নাই, হয় তো এই কথা বলিবার দিন একদিন আসিবে।

উপন্যাস

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭

সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠিয়াছিল।

ধীরেন দীপককে বলিল, চল বাইরে যাই। আকাশের এই মূর্ত্তিটা আমার বড় ভাল লাগে। ইচ্ছে হয় ঐ ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে একবার পৃথিবীর ওপর দিয়ে অম্‌নি করে উড়ে চলে যাই।

দীপক বলিল, কিন্তু তার আগে আমাদের উৎসবটা শেষ করে যেও। ঝড় আরও উঠবে, তার জন্য এত তাড়া কেন? কিন্তু কাল যে উৎসব।

ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, উৎসবের নাম কি দেবে?

দীপক বড় বিপদে পড়িল। বলিল, নাম ছাড়া কি উৎসব হতে পারে না ধীরুদা?

ধীরু বলিল, না, একটা নাম থাকা ভাল।

দীপক বলিল, উৎসবটা মনকে আনন্দ দেবার জন্য। আনন্দের কি বহু নাম আছে?

এমন সময় ঐ ঝড় বাতাসের মধ্যে শোভনা আর সুষমা আসিয়া উপস্থিত হইল।

শোভনার সঙ্গে সুষমাকে দেখিয়া দীপক একটু অবাকই হইল।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ধীরেন বলিল, তুমি যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েছ। কেন, উনি ত আজকাল সময় পেলেই এখানে আসেন! ওঁরই ত সবার চাইতে বেশী উৎসাহ।

শোভনারা কাছে আসিলে সুষমাই আগে কথা বলিল। বলিল, দীপক, আজ রাত্রের মধ্যেই জায়গাটা পরিষ্কার করে না ফেল্‌তে পারলে কাল আর অত সময় পাওয়া যাবে না।

সুষমার এই আগ্রহ, উৎসবের জন্য এই ব্যাকুলতা দেখিয়া দীপকের বড় আনন্দ হইল। সে বলিল, যে ঝড় উঠেছে, এখন পরিষ্কার করে কিছু লাভ হবে না। তার চাইতে কাল সকালে খুব ভোরে উঠে লেগে গেলেই হবে।

তারপর কথায় কথায় তাহারা সকলে মিলিয়া একবার সারা বাগানটা ঘুরিয়া দেখিল। কোথায় বেদী হইবে, কোথায় অভিনয় হইবে, কোথায় কাহারা বসিবে তাহা ঠিক হইয়া গেল। তবে সকলেরই মনে একটা আশঙ্কা যদি কাল সন্ধ্যেবেলাও এমনি ঝড় ওঠে!

তাহারা ফিরিয়া আসিতেছিল এমন সময় মালা, বিমলা আর পুষ্প আঁচল ভরিয়া ফুলের আর পাতার বোঝা লইয়া পেছনের ছোট বনটা হইতে বাহির হইয়া আসিল। বন-মল্লিকার উগ্র গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে পুষ্প বলিল, বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

শোভনা তাহাদের বকুনি দিয়া বলিল, এতক্ষণ অবধি ঐ জঙ্গলে না থাক্‌লেই হোত। তোমাদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

একখানা দা হাতে করিয়া প্রসাদ আসিয়া বলিল, বোধ হয় সত্যিই ওটা সাপ দিদিমণি। কোন্ দিকে পালিয়ে গেল টের পেলাম না।

প্রসাদকে দেখিয়া শোভনা তবু একটু আশ্বস্ত হইল।

বিমলা বলিল, এত ফুল যে আর লোভ সাম্‌লাতে পারলাম না ভাই! আমরা চার জনে তুলে কুল পাই না।

দীপক হাসিয়া বলিল, বড় বৌদিও তা হলে এবার সত্যিকারের পাগল হলে?

বিমলা হাসিয়া বলিল, তুমি যেখানে সেখানে দেবতা পর্য্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

পুষ্প বলিল, উনি তা হলে পাগল?

সুষমা বলিল, পাগলেরও বাড়া। তা নইলে সারাটা জীবন কেবল বাজে কাজ করে গেল ওর!

দীপক বলিল, নূতন বৌদি, পৃথিবীর পনেরো আনা লোকই ত কাজ করে, এক আনা না হয় অকাজই করল! তাদের ওপর আর বিরূপ হয়ো না।

সুষমা কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল, ঐ এক আনাই যে পনেরো আনা লোককে শুদ্ধ বে-হিসেবী করে তোলে! এই জন্যই ত যত আক্রোশ লোকের ওদের ওপর।

এমন সময় পিছন হইতে অজয় আসিয়া বলিল, সত্যি তাই। তোমাদের সবাইকার পাগলামীর জ্বালায় আমাকে পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হোল।

শোভনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বাড়ী যাও নি?

অজয় বলিল, গিয়েছিলাম বই কি! কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারলাম কই? ভাবলাম, একবার দেখেই আসি এই ঝড় বাতাসে তোমরা আবার কি ঝড় তুলেছ।

সবাই হাসিয়া উঠিল।

প্রসাদ আর মালা স্কুল-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। অপর সকলে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে পুষ্প জিজ্ঞাসা করিল, সেই মেয়েটির কিছু করতে পারলেন?

দীপক বলিল, কে, ময়না? না, এখনও তার কিছু ব্যবস্থা করতে পারি নি। তবে কালু তাকে মুক্তি দিতে রাজী আছে।

পাশেই বিমলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ময়না কি মুশলমান?

দীপক বলিল, হ্যাঁ, আমার ত তাই মনে হয়। কালু নিজেও জানে না ময়না কি জাত।

পুষ্প বলিল, ওকে কেন এখন কয়েকদিনের জন্ম আমাদের কাছে এনে রাখুন না।

দীপক বলিল, তারও একটা বাধা আছে। সেই সেই থেকে ময়নার আবার কালুর ওপর কেমন একটা টান্ পড়েছে। কালুকে একলা ফেলে চলে আসতে ময়না নিজেই এখন বিশেষ রাজী নয়। ও বলে, আমি চলে গেলে সর্দ্দারকে দেখবে কে?

বিমলা বলিল, এই ময়নাই না আবার কালুর পিঠে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল?

দীপক বলিল, তা হলে কি হয়? কালু যে ওকে এখন মা বলে' ডাকে।

বিমলা বলিল, কি দুর্ব্বল এই মেয়ে জাতটা। ঐ মা ডাক্ ময়নাকে সব ভুলিয়েছে।

পুষ্প বলিল, তবে থাক্ না ও ওখানে।

দীপক বলিল, হ্যাঁ, এখন ত দিন কয়েক তাই হবে।— কিন্তু আমাকে রোজ যেতেই হবে—

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল ত?

দীপক বলিল, ঐ ওরা, ওরা বুঝেছে ওরা আর ভিখারী থাকবে না। আমরা ওখানে চাষ-ক্ষেতি আরম্ভ করে দিয়েছি। ময়না হয়েছে এখন ওদের রাণী। ময়নার কথায় ওরা এখন প্রাণ দিতে পারে।—কালু ওদের যার যার কাজ বেছে দেয়।

পুষ্প জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে ঐ বুড়ী সর্দ্দারনীটার কি অবস্থা?

দীপক হাসিয়া বলিল, সর্দ্দার-বুড়ী? এখন ও বেতের ঝুড়ি তৈরী করে। আরও সব মেয়েরা আছে, তাদের বাঁশ দিয়ে টুক্‌রী বোনা শেখায়। বুড়ীটা জানে কিন্তু অনেক!

বিমলা বলিল, তাহলে ত ওদের একটা তবু ব্যবস্থা হোল।

দীপক একটু ভাবিয়া বলিল, এখন ত অন্তত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভিক্ষে করে' ওদের কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে মাঝে মাঝে ওরা তাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ভিক্ষে করাটাই যেন ওদের ভাল লাগে, ওটাই যেন ওদের কাছে সহজ।

পুষ্প আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যে বল্‌তেন ওদের মধ্যে অনেক চোর, গাঁট-কাটা বদমায়েস লোকও আছে, এখন তারা কি করছে?

দীপক হাসিয়া বলিল, এক খৃষ্টান-মিশনারীরা গেলে যদি ওদের তরাতে পারে। নইলে ওদের শোধরান শিবের অসাধ্য। ওরা যেমনকার তেমনি আছে। তবে এখন একে একে অনেকে সরে পড়ছে। জায়গাটা আর সুবিধার নয় বলে ওরা টের পেয়েছে।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক ওরা কারা?

দীপক বলিল, তা তো জানি না। তবে ওরা এই ভিক্ষুকদের দিয়ে অনেক কাজ সারত। লুকিয়ে কোকেন বিক্রীর ব্যবসাটাও ওরা ঐ ভিখিরীদের দিয়ে চালাত।

পুষ্প বলিল, আচ্ছা, এ সব কথা পুলিশ জানতে পারে না?

দীপক একটু অর্থপূর্ণ হাসি টানিয়া বলিল, আমাদের দেশের পুলিশ মন্দ কাজের সব কথাই জানে। তারা না জান্‌লে এত চুরি এত জোচ্চোরি কি হতে পারত? আমার ত মনে হয় না। ওরা সব জানে বলেই এদের পক্ষে এই সব ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া সোজা হয়ে উঠেছে। ওরা পুলিশকে নিজে থেকেই জানায়, আর তার জন্য মূল্যও দিতে হয়।

ধীরেন বলিল, কিন্তু দীপক, তুমি জেনে শুনে এ সবের প্রশ্রয় দিচ্ছ!

দীপক বলিল, অনেকের অনেক দুষ্কৃতির কথাই জানা যায়, কিন্তু সব সময় তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা শোভনও হয় না, কোনও কাজেরও হয় না। শুনেছি বাঘ যেখান দিয়ে চলাফেরা করে সে রাস্তাও বন্ধ করা যায়, কিন্তু ইন্দুরের গর্ত্ত বোজান বড় শক্ত। মাটীর তলা দিয়ে যাদের যাতায়াত তাদের পথ বন্ধ করা অনেক সময় মাটীর ওপরের মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

ধীরেন একটু শক্ত করিয়াই বলিল, কিন্তু সমাজকে দেশকে ওরা কতখানি কলুষিত করছে!—তাতে বাধা দেওয়াও ত কারুর উচিত।

দীপক কোনও উত্তর করিবার পূর্ব্বেই পুষ্প বলিল, দেখুন ধীরেন বাবু, সমাজটা একখানা থালা বা বাসন নয় যে খানিকটা ছাই দিয়ে মেজে নিলেই ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠ্‌বে। প্রায়ই দেখা যায় নালিশ যে করে সে ভুলে যায় যে তার বিরুদ্ধেও অন্য কারুর কিছু নালিশ করবার থাকতে পারে। সমাজটা আমাদের দিয়েই তৈরী। আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাসেই ওর ক্ষতি, আর আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশেই ওর জীবন।

অবকাশ না দিয়া ধীরেন একটু কড়া করিয়া বলিল, আপনি যদি এই কথাগুলি আমাকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন, তাহলে আমি বলি নিজের দিক্ চেয়ে যদি কেবলই চল্‌তে হয় তাহলে ক'টা লোক সমাজের হিত করতে পারে বা করবার উপযুক্ত?—এবং আমি যদি উপযুক্ত না হই তাহলে হয় ত আপনিও নন্।

পুষ্প একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, আমাকে আঘাত করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে করুন। কারণ, আমি নিজেকে বাদ দিয়ে কোনও কথা বলি নি। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিত করার চেষ্টাটার মধ্যে আত্মশুদ্ধিরও একটা চেষ্টা থাকা ভাল।

ধীরেন তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, এ কথাটাও কি আপনি আমাকে লক্ষ্য করেই বল্‌ছেন?

পুষ্প বলিল, না ধীরেন বাবু, সে কথা আমার মনে ছিল না। থাকলে স্বীকার করতাম। কিন্তু আমি বলেছি সমাজের আশ্রয়ে যারাই আছে—তাদের সকলেরই সম্বন্ধে।

ধীরেন জোর পাইয়া বলিল, তাহলে আপনি বলতে চান্, যারা সমাজ-সংস্কার করতে চান্ বা সমাজের সমস্ত কলুষকে দূর করতে চেষ্টা করেন তাঁদের তা করা উচিত নয়?

পুষ্প খুব ধীর স্থির ভাবে উত্তর করিল, আমার কথায় কি তাই বোঝাল ধীরেন বাবু? সাদা কথায় আমি এই বলতে চাই, যে দোষস্খালনের জন্য আমি চেষ্টা করছি, আমার নিজের মধ্যে সে দোষ কতখানি আছে—তা জানা দরকার এবং সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে সে দোষ থেকে মুক্ত করবার একটা প্রবল চেষ্টা থাকা অন্তত প্রয়োজন।

অজয় একটু দূরে ছিল। সে বলিল, পুষ্পর কথার স্বপক্ষে আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই। আমার এক সহপাঠী এখন একজন অধ্যাপক, এবং সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সোরগোল করছেন। কিন্তু তিনি নিজে যত অশ্লীল বই পড়েন ও অশ্লীল ছবি সংগ্রহ করেন এমন বোধ হয় অনেক লোকই করে না। তারপর একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, অবশ্য এ জন্য তাঁর হয় ত একটা অজুহাত থাকতে পারে যে, অশ্লীলতার কত রকমের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হতে পারে তাই তিনি গবেষণা করছেন।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কেবল ধীরেন একটু আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ কথা এ ক্ষেত্রে মোটেই খাটে না। একজন লোক যদি ও রকম হয়ই তা বলে সকলের তাতে দোষ হতে পারে না।

অজয় বলিল, আমিও সে কথা বলি না ধীরেন। আমি বিশ্বাস করি, মনের সত্যিকারের শুভ সঙ্কল্পেরও একটা দাম আছে। তা সত্ত্বেও মানুষ যেখানে অক্ষম সেখানে তার অপরাধ হলেও মার্জ্জনীয় কিন্তু যে মানুষ জেনে-শুনে লোক ঠকাতে চেষ্টা করে তার সে অপরাধ মানুষ মার্জ্জনা করতে পারে না।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া তর্কটা যেন ঢিমে পড়িয়া গেল।

দীপক পুষ্পকে বলিল, আজ আর আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারব না, আমার কিছু কাজ পড়ে আছে, আজকের মধ্যেই তা সেরে নিতে হবে।

কাজেই শোভনা ও অজয় পুষ্পকে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

পথে শোভনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ধীরেন বাবুকে তোর কেমন লাগে পুষ্প?

অজয় একটু আগে আগেই চলিতেছিল।

পুষ্প বলিল, কেন, আমার ত বেশ লাগে।

শোভনা হাসিয়া বলিল, এ রকম লোককে বিয়ে করতে পারিস্?

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বলিল, এর চাইতে খারাপ লোককে পারি!

শোভনা এবার একটু জমাইয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, সত্যি যদি ধীরেন তোকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে তুই অমত করবি না?

পুষ্প শোভনার মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিল, আমি জানি, উনি আমাকে বিয়ে করতে চান্।

শোভনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল, সত্যি জানিস্?

পুষ্প আবার ধীরে ধীরে বলিল, জানি মানে আমি তা' টের পেয়েছি, আর এর মধ্যে দীপক বাবুর অনেকখানি হাত আছে।

শোভনা দেখিল পুষ্পকে নূতন কিছু বলিবার নাই। তাই সে বলিল, দীপক আমাকে সেই কথাই বলেছে। তার খুব ইচ্ছা তুই ধীরেনকে বিয়ে করতে রাজী হোস্। কিন্তু তার মনে বড় ভয় বুঝি তুই কিছুতেই তা' করবি নে। দীপক তোর বাবা মাকেও বলেছে।

পুষ্প বলিল, হ্যাঁ, এক এক জন লোক এমন থাকে যাদের গায়ে পড়ে পরের উপকার না করতে পারলে রাত্রে ঘুম হয় না।

কথাটার মধ্যে একটু ঝাঁঝ ছিল। হঠাৎ এমনতর কথায় শোভনা একটু দমিয়া গেল। তাই এবার অপ্রস্তুত ভাবেই বলিল, তুই দীপককে কি এতদিনেও চিনলি না?

পুষ্প নির্ব্বিকারভাবে বলিল, চিনি বলেই ত এ কথা বল্‌লাম।

শোভনা আবার বুঝাইয়া বলিবার জন্য বলিল, ধীরেনই ওকে একটু জোর করে ধরেছে। ওকে ত জানিস্, ও তোকে কত ভালবাসে। ওর ইচ্ছা তুইও সুখী হোস্, ধীরেনও তোকে পেয়ে সুখী হয়।

পুষ্প বলিল, দীপক বাবুর একটা ইচ্ছা কেন, অনেক ইচ্ছাই থাক্‌তে পারে কিন্তু আমি তাঁকে এমন অধিকার দিই নি যাতে করে আমি কিসে সুখী হব বা না হব তার জন্য উনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করবেন।

শোভনা ধরিতেই পারিল না ব্যাপারটা এমন করিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া গেল কেন? শোভনা তাই আর কোনও কথা তুলিল না।

পুষ্প খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ দিদি,

তোমাদের সঙ্গে অনেক কাল ধরে মিশ্‌ছি এবং এটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা বলেই মনে করি। সেই জন্য যদি বল, পুষ্প, তুমি আজ হতে ছিদাম মুদীকে ভালবাস্‌তে পারলে তুমি খুব সুখী হবে তাহলে আমার পক্ষে তোমাদের সে ইচ্ছা পালন করাটা একটু কঠিন হয় না কি?

শোভনা বলিল, তোমাকে ত ছিদাম মুদীর কথা বলা হয় নি।

পুষ্প বলিল, ছিদাম মুদীর স্ত্রী বা তার আত্মীয়দের কাছে সে হয় ত কেবলমাত্র ছিদাম মুদী নয় কিন্তু অপরের কাছে তার বেশী আর কিছু কি?—একটু থামিয়া বলিল, তবে কথা আমি দিচ্ছি, দীপক বাবুকে বলো, আমি প্রস্তুত। তিনি যজ্ঞের আয়োজন করতে পারেন।

অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে কেহ আর কোন কথা বলিল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া বিদায় লইবার সময় পুষ্প শোভনার গলা জড়াইয়া ধরিল।

অজয় দু'এক পা অগ্রসর হইয়াছিল, আবার আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পুষ্পর অশ্রুর প্রবাহ যখন শোভনার বক্ষ ভাসাইয়া দিয়া চলিল তখন শোভনা আর্দ্রস্বরে বলিল, কি হয়েছে বোন্? একটু স্থির হও, এমন করে কাঁদে না।

পুষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিল, জানি তা। তবু আজ আমাকে একটু কাঁদতে দাও দিদি।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে হঠাৎ পুষ্প নিজেই মাথা তুলিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিল, এইবার যাও দিদি, কঠিন কিছু বলে থাক্‌লে ক্ষমা করো।

পথে ফিরিতে ফিরিতে শোভনা শুধু ভাবিতে লাগিল, তবে পুষ্পর মনের কথা কি?

—ক্রমশ

ডাক-ঘর

নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের শুভাধ্যায়ীদিগকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি। অনুগ্রাহকবর্গের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে কল্লোল পত্রিকা পাঁচ বৎসর চালান অসম্ভব হইত। ইঁহাদেরই চেষ্টা ও শুভ কামনায় কল্লোল এই পাঁচ বৎসরে যেটুকু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। আশা রাখি, সকলের সমবেত চেষ্টায় উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। পত্রিকার সম্পাদন ব্যাপারে যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

অর্থবল যাহাদের কম, এ রকম একখানা কাগজ চালাইবার পক্ষে তাহাদের বহু বাধা; বাহির হইতে তাহা অনুমান করা যায় না। এ সকল বাধা বিঘ্নও, ত্রুটি ঘটিবার অন্যতম কারণ। পত্রিকার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গিয়া অনেক জিনিষ আমরা ইচ্ছা করিয়াই পরিহার করিয়া থাকি, কল্লোলের পাঠকবর্গ আশা করি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ষষ্ঠ বর্ষে ইহার রচনার দিক দিয়া বিশেষভাবে উন্নতির চেষ্টা করিব। আমাদের বিশ্বাস, ইহাই সাহিত্য-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ও উপায় হওয়া উচিত।

—

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি ছবি এবার আমরা দিলাম। এখানি শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দ্বারা প্রস্তুত জগদীশচন্দ্রের মৃণ্ময় মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ্। মূর্ত্তিটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কলিকাতার বহুশিল্পী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শিল্পীর হাতে গড়া বহু সাধনার ধনের এইটুকুই বোধ হয় আসল দাম। ইহার পর এই মূর্ত্তিটি তাম্রমূর্ত্তিতে পরিণত হইবে।

জগদীশচন্দ্র, তাঁহার পত্নী ও একজন সহকারী সহ ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। লীগ্-অফ্-নেশনের আমন্ত্রণে প্রথমে সেখানে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইবে এবং পরে তিনি সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বহু স্থানে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

তাঁহার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আমরা তাঁহাকে দেশস্থ সকলের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

—

আগামী ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মতিথি। জন্ম মৃত্যুর যাতায়াত নিত্যই আমাদের চোখের উপর দিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে। সুখ-দুঃখ, শোক-আনন্দ, পাপ-পুণ্য আমাদের এই সংসারভিত্তিকে আলোকে ছায়ায় সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে; এই পৃথিবী বিচিত্র, মানবস্রোত তাহারই ভিতর চঞ্চল, অস্থির;—ইহারই ভিতর, যেখানে নির্ম্মল নিভৃত, কবি সেখানে এক, একক অথচ চির-প্রকাশমান। জীবন-মৃত্যুর এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ভিতরে কবির ভাষা দিগদিগন্তে কোথাও নীরবে, কোথাও কর্ম্মের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। সংসারকে তাই দেবালয় বলিয়া মনে হয়। কবি এক হইলেও সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্। কবির কবিত্বশ্রী মানুষকে দেবত্বে অভিষিক্ত করে। কবি তাই চিরঞ্জীব। আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মত্যাগী কবি সমগ্র অন্তরের ধন বিলাইয়া দিয়াও নিত্যকাল আপনার রসভাণ্ডার হইতে নবজন্ম লাভ করেন।

কবির জন্মতিথি তাই এক নয়, বহু। কাব্যের রসশ্রী যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে সেই কবির জন্মতিথি তাই মানবের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের দিন।

আমাদের কবির এই শুভজন্মদিনে আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

—

গত বৎসরে 'যাদুঘর' ও 'দীপক' দুইখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। দুইখানি উপন্যাসই বৎসরের ভিতর সমাপ্ত হইবে বলিয়া আমাদের আশা ছিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে-নাই বলিয়া এ বৎসরেও ঐ দুইটি উপন্যাস প্রকাশিত হইল। বোধ হয় আর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। তবুও আমরা জানি আমাদের নূতন গ্রাহকদিগের পক্ষে ইহাতে কিছু অসুবিধা হইবে। তবে যাঁহারা এই উপন্যাস দু'খানি প্রথম হইতে পড়িতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা লিখিয়া জানাইলে গত বৎসরের কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা পাইতে পারেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা পড়িবে। গত বৎসরের সম্পূর্ণ সেট্ নাই, তবু মাত্র দুই একটি সংখ্যা ভিন্ন সত্বর জানাইলে বোধ হয় অধিকাংশ সংখ্যাই দেওয়া যাইবে। অনিচ্ছাকৃত হইলেও এরূপ অসুবিধা হইবার জন্য আমরা বিশেষভাবে লজ্জিত।

—

গত ৪ঠা চৈত্র শনিবার এবং ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার বিশ্বভারতী সম্মিলনী হইতে জোড়াসাঁকোস্থ 'বিচিত্রা' গৃহে দুইটি আলোচনা সভা আহূত হয়। দুইদিনই বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা কয়েকজনও নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

আমরা স্থানীয় ও বিদেশস্থ অনেকের নিকট হইতে পত্র পাইতেছি, তাঁহারা আলোচনা-সভার এই দুই দিনের সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের নিকট জানিতে চাহেন। প্রত্যেকের

পত্রের উত্তরে এরূপ দীর্ঘ বিষয় সম্যকভাবে লিখিয়া জানান অসুবিধা। এই সভার বিবরণ কখনও প্রকাশ করিতে হইবে আমরা তাহা বিবেচনা করি নাই, তাই সমগ্রভাবে উহার কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি নাই। তাই পত্রিকার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু স্থানাভাববশত এবারে তাহা সম্ভব হইল না।

ঐ দুইটি সভার প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা' ও দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল 'সাহিত্য সমালোচনা।'

এই সভার প্রথম দিন মাইকেল মধুসূদনের কথা অবতারণা করিয়া কবি বলেন, ম সূদনের মনের সাম্‌নে কাব্যের একটা রূপ ছিল, সেই রূপকে সার্থক করিবার জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভায় বাঙালা ভাষাকে নিজের মত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনি এ জন্য বাঙলায় কি কথা চল্‌তি তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই পৌরাণিক যুগের শৌর্য্য বীর্য্য মহিমার যে দৃশ্য তিনি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহাকে কাব্যে ব্যক্ত করাই তাঁহার সাধনা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরে বলেন, নব যুগ বলিয়া সাহিত্যে কিছু আছে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। সাহিত্যের মহারথীরা পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়াও আসেন না, তাঁহারা যুগান্তর আনেন না। বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিম হইতে ধারাবাহিক গল্পের এক নূতন রূপ পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় সেই সকল গল্পের রূপকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অনুকরণ তিনি করেন নাই। পশ্চিম হইতে তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন মাত্র এবং সেই প্রেরণাকে তিনি নিজের প্রতিভায় সার্থক করিয়াছিলেন।—যুগ হিসাবে সাহিত্যকে ভাগ করা অন্যায়। সাহিত্যের সত্যকারের কোনও সিংহাসন নাই যে, একজনকে না সরাইলে আর একজন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না।—অনুকরণ মাত্রই যে দোষের তাহা নয়। অনুকরণের ভিতর দিয়া সত্যকার সাহিত্যিক তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা খুঁজিয়া পান।—সাহিত্যের বিষয়-বস্তু কি, তাহার উপর সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করে না। লেখক নিজের রূপকে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন কিনা এবং তাহা সত্যকার সাহিত্য হইয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য। সাহিত্য বিষয়-বস্তু হইতে অপরূপ কৌশলে রস সৃষ্টি করে। সেই রসসৃষ্টি যেখানে না হয় সেখানে বিষয়ের কোন পৃথক মূল্য নাই।

আলোচনা-প্রসঙ্গে আবশ্যক হইয়া পড়ে বলিয়া সমালোচনার নামে যে জঘন্য ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অত্যন্ত নীচতার সহিত কাহারও পারিবারিক কুৎসা প্রচার হয় এ জন্য রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদিগকে, বিশেষ করিয়া নবীন লেখকদিগকে তিনি বলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের কোনও পার্থক্য নাই এবং তিনি এটি জানিতেন বলিয়াই তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

গালাগাল সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা সহ্য করিতে হইবে। তিনি নিজেও অনেক সহ্য করিয়াছেন। উহাকে ভয় করিলে চলিবে না।

দ্বিতীয় দিনের সভায় পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা অধিক লোক-সমাগম হইয়াছিল। সেদিনকার আলোচনার বিষয় ছিল 'সাহিত্য সমালোচনা।'

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বলেন, মানুষের মধ্যে যাহা চিরন্তন শ্রদ্ধার অধিকারী সেই মহামূল্য মনুষ্যত্বের পরিচয়ই আমরা সাহিত্যে পাই। যে ক্ষুধা বা যে প্রবৃত্তি মানুষের ক্ষুদ্র, যাহা ভোগ করিলে আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না তাহা লইয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা সার্থক হয় নাই। মানুষের যে সব ক্ষুধা যে সকল কামনা পূর্ণ হইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেই উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্য্যই কাব্যে, শিল্পে, বর্ণে, বাক্যে ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করে।

যাহাকে আধুনিক সাহিত্য বলা হয় তাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু বলেন নাই। শুধু দুই একটি অস্পষ্ট লেখার গতি দেখিয়া সাহিত্যের বিপদ সম্বন্ধে ভীত হইয়া তিনি নিজের কথা লিখিয়াছেন। তাহাতে কাহাকেও তিনি নিন্দা করিতে চাহেন নাই।

তিনি আরও বলেন, সাহিত্যে দোষ ত্রুটি থাকে। যে সমস্ত দোষের কথা তিনি বলিতেছেন তাহা তাঁহার নিজের লেখাতেও অল্প বিস্তর আছে। 'সে কথা অস্বীকার করব এত বড় দাম্ভিকতা আমার নেই' বলিয়া তিনি লেখার সমগ্রতা দিয়া লেখার বিচার করিতে বলেন।

সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ নবীন লেখক কয়েক জনকে ডাকিয়া বলেন, তাহারা যেন রাগ না করে। তাঁহাকেও একদিন শুধু নয়, চিরকাল ধরিয়াই আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। 'তোমাদের শক্তি আছে তোমরা নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে নিজের পথ কেটে যাবে, সত্যকার সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তোমরা নিজেদের সত্যকার মর্য্যাদা দিও।'

পরে সেদিন সভা ভঙ্গ হয়। এই দুইটি সভার আলো-আলোচনার একটা বিস্তৃত বিবরণ স্থান পাইলে হয় ত পরে প্রকাশ করিতে পারিব। সভায় যে সকল অনাবশ্যক বাক-বিতণ্ডা হইয়াছিল তাহা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথার মর্ম্মই জানাইলাম। ইহাতে লেখকদের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,
১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল

কল্লোল

ষষ্ঠ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

তবু তোমা ভুলি নাই

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তবু তোমা ভুলি নাই। যদিও আকণ্ঠ, হায়, ডুবে' গেছি পঙ্কিল সাগরে,
কলঙ্ক-অঙ্কনে দেহ পঙ্কভুক্‌ ক্রিমি-সম হ'য়ে গেছে বিবর্ণ, কুৎসিত,
মদিরার তিক্ত বিষে আরক্ত হয়েছে আঁখি, বহ্নি-দাহে জ্বলেছে শোণিত,
হৃদয়ের শত তন্ত্রী যদিও উচ্ছিন্ন হ'য়ে কাঁদিয়াছে ব্যর্থ আর্ত্তস্বরে।
তবু তোমা ভুলি নাই। হয়-তো পড়েছি কোনো রূপসীর আঁখির আখরে
নব-প্রণয়ের লিপি; ক্ষণ-পরে মিলায়েছে মেঘ-গর্ভে চঞ্চল তড়িৎ;
স্বর্ণ-মূল্যে কিনিয়াছি স্বর্ণ-বর্ণী কেশ আর রসক্লান্ত চুম্বন লোহিত,
আচ্ছন্ন রেখেছি মন সমুদ্র-তরঙ্গ-সম সঙ্গীতের উন্মাদনা-ভরে।

সুরা আর তিক্ত নয়, মোর কাছে ক্ষিপ্তসম সঙ্গীতের মোহ নাই আর,
আজিও সন্ধ্যার লগ্নে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ে কেশগন্ধ স্মরি যে তোমারি,
শ্রাবণ-শর্ব্বরী-শেষে মদালস আঁখি মেলে হেরি যবে বিষণ্ণ আঁধার,
রক্ত-দৃষ্টি-অন্তরালে কাজলের স্নিগ্ধরেখা অশ্রু-ভারে সহিতে না পারি।
আমার উৎসব-দীপ ম্লান হ'য়ে যায়, আহা, কাঁদে হা হা বাউল বাতাস,
আমার বিষাক্ত রক্তে উচ্ছ্বসিছে অলক্ষিতে তব দূর স্পর্শের নিঃশ্বাস॥

তোমারে বেসেছি ভালো

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তোমারে বেসেছি ভালো, এই মোর জীবনের একমাত্র অহঙ্কার হোক্,
আর-সবি মুছে' যাক্। সাগর-সৈকতে আঁকা শিশুর নিরর্থ লিপি-সম
মৃত্যুর তরঙ্গ-ঘাতে ভেসে যাক্ ভিত্তিহীন, শূন্যগর্ভ সব কীর্ত্তি মম,—
কিছু ক্ষতি মানিবো না। শুধু একদিন যেই অপরূপ, অপূর্ব্ব আলোক,
তোমার নয়ন হ'তে উপহার পেয়েছিলো আমার তমসাচ্ছন্ন চোখ—
থাক্ তাহা চির-তরে। স্বচ্ছ হ'য়ে যাবে তবে মরণের মন্ত্র-স্তব্ধ তমো,
পথ চিনে' চলে' যাবো স্বর্গের তোরণ-দ্বারে সদ্যোশাপমুক্ত দেবোপম,
বিধাতারে সম্ভাষিবো হাসিমুখে—মোর চোখে যদি জ্বলে পবিত্র পাবক।

তোমারে বেসেছি ভালো, এ-কথা জানে না কেউ পৃথিবীর ভাই-বোন্ মোর,
তাই তা'রা ঘৃণা-ভরে অনাদর করে মোরে, করে মোর নিত্য, অসম্মান;—
তা'রা শুধু জানিয়াছে মোর মিথ্যা গর্ব্ব যত, হেরিয়াছে বাসনার ঘোর
সর্পাশ্লেষাবদ্ধ দেহ দেখিয়াছে, দেখে নাই বহ্নিরাগদীপ্ত মোর প্রাণ।
বিধাতারে জিনে' নেবো হাসিমুখে—যেই গর্ব্বে এত বড় করিয়াছি আশা,
সে-গর্ব্ব জানিলে পরে তা'রা কি দিতো না মোরে হৃদ্-প্রান্তে এতটকু বাসা

আলোর নীচেয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবে গোটাকতক বেণে মিলিয়া ভারতে বাণিজ্য স্থাপনের কল্পনা করিল; ফল হইল এত বড় বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন। কলিকাতা 'বেদেপাড়া বাল্যবিবাহ-রোধিনী সভা'র ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া নামিয়া গেলে এমনি একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় আসিয়া পড়িতে হয়। তারিখটা ঠিক মনে নাই—তবে দিনটা ছিল রবিবার।—রবিবারের আলস্য মজলিসে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যের সাতাশী বৎসর বয়সে বিপত্নীক মরিবার কথা উঠিল; অত বয়সে বিপত্নীক অবস্থায় মরা খুব স্বাভাবিক নিশ্চয়, কিন্তু সেই সময় নাকি খবরের কাগজগুলা কি একটা কারণে বাল্য-বিবাহের দোষ-গুণ লইয়া আপোষের মধ্যে খুব গালাগালি করিতেছিল, তাই যে যে-কাগজের ভক্ত সে সেই কাগজের মত সমর্থন করিয়া এই সামান্য বিষয়টা লইয়াই দুইটা দল খাড়া করিয়া লইল। এক পক্ষ বলিল—'সেই পোনর বৎসরে সাত তাড়াতাড়ি বিবাহ না কোরলে আজ বুড়া বয়সে স্ত্রীর সেবাটা খেয়ে যেতে পারতেন ... লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' অপর দল শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া বলিল—'হ্যাঁ, স্ত্রীটিও এতদিন সত্তর পঁচাত্তর বয়সে দিব্যি সেবার উপযুক্তটি হোয়ে উঠতেন।' অপর পক্ষ হইতে গাল দিয়া বলিল—'এ নেহাৎ ইতর ম্লেচ্ছের কথা; হিন্দুর ললনা স্বামীসেবাকার্য্যে বয়সের খেয়াল করে না।' একজন জবাব করিল—'খুব ভট্‌চায্যি গোছের কথা বটে, কিন্তু ও মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুর সঙ্গে কলিকালে কোন্ মেয়ে পাল্লা দিত শুনি?' এই রূপে ক্রমে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যে ও বাল্যবিবাহ ছাড়িয়া তর্কটা নিছক বিদ্রূপ এবং গালাগালির কোঠায় নামিয়া আসিল। সদাশিব চক্রবর্ত্তীর রোয়াকের উপর যে রৌদ্রটা প্রথমে বেশ মিঠা ঠেকিতেছিল সেইটাই ক্ষণেকের মধ্যে তার্কিকগুলির কপালের শিরা ফুলাইয়া তাহাদের উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ চলিল;—রাস্তার উপর বটুক বাবুদের সহিস্, পাড়ার গোটাকতক ছেলেমেয়ে, একজন ঝাড়ুদার, একটা ঝালচানা-ওয়ালা, একটা হিং ফিরি-ওয়ালা কাবুলি প্রভৃতি লইয়া একটা মাঝারি গোছের ভিড় জমিয়া গেল।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ঠিক হইল—সে যাই হোক্, পাড়ায় একটা 'বাল্যবিবাহ-রোধিনী সভা' হওয়া দরকার। চাঁদার অভাবে পাড়ার থিয়েটারের আখড়াটা সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কোনও হুজুগ্ নাই, সুতরাং বিপক্ষ দলেরও কেহ আপত্তি করিল না। সদাশিব চক্রবর্ত্তী ছোট মেয়ের পাছাপেড়ে আটহাতি ডুরে শাড়ীটি পরিয়া হুঁকা হাতে এই মজলিশেই বসিয়া গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে জোগান দিয়া তর্কটিকে চালিত করিয়া আসিতেছিলেন। নিজের বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, সুতরাং তাঁহার কথার আজ দাম ছিল। মীমাংসা হইয়া গেলে হুঁকাটি দেওয়ালে হেলাইয়া রাখিয়া বলিলেন—'এ তো অতি উত্তম কথা; তোমরা আমার বাইরের ঘরটিতেই লাগিয়ে দাও না, কে মানা করে। তবে ঐ এক কথা রে দাদা, রাখতে পারা চাই; নইলে শুধু ...'

সতীনাথ মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—'আল্‌বৎ থাকবে—আপনাকে কিন্তু সভাপতি হোতে হবে চক্কোত্তী মশায়; অন্তত প্রথম বছরটা সামলে দিতেই হবে।'

সকলের নিকট হইতে অনুমোদনের একটা অব্যক্ত রব উঠিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎসাহের সহিত বলিলেন—'সে কি কথা!—দরকার পড়ে হব বৈ কি, এতগুলো ইয়ংম্যানের উৎসাহ! ...'

হারাধনের এ দিকে তেমন মন ছিল না। তর্কের মধ্যে সে যে একটি মোক্ষম উত্তর পাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল,

তাহারই একটা লাগসই জবাব খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে মনে মনে হয়রান হইতেছিল। যদিও বা একটা উত্তর শেষ পর্য্যন্ত পায়, তাহা হইলেও বিতণ্ডা থামিয়া যাইবার পর দিলে বড় বেথাপ্পা হইয়া পড়িবে ভাবিয়া সে তর্কটিকে সজীব রাখিবার জন্য বলিল—'তা সভা কোরবেন কোরুন চক্কোত্তী মশায়; কিন্তু ছেলেবেলায় বিয়ে কোরেছিলেন বোলেই যে দিগম্বর ঠাকুদ্দা—আপনার গিয়ে সাতানব্বই বছরে বিপত্নীক মারা গেলেন এ কথা আমায় বিশ্বাস করাতে পারলেন না। এর পরে কোন্ দিন আপনারা বোলে বোসবেন, ওঁর বাড়ীর দেওয়ালটা যে ভূমিকম্পে পোড়ে যায়, সেও ছেলেবেলায় বিয়ে কোরেছিলেন বোলে'—বলিয়া, তাহাকে থাবা দিয়া যে থামাইয়া দিয়াছিল সেই সতীনাথের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিল।

সতীনাথ যাইবার পূর্ব্বসূচনাস্বরূপ আড়ম্বরের সহিত একবার আলস্য ভাঙ্গিবার আয়োজন করিতেছিল, মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটু হাসিল, তাহার পর খুব গম্ভীর ভাবে কহিল—'যদি আপনার কথাই ধোরে নেওয়া যায় হারাধন বাবু, তা' হোলেও বাল্যবিবাহের জন্যে কত বাড়ীর শুধু পশ্চিম কেন, পুব, উত্তর, দক্ষিণ—সব দিকেরই দেওয়াল ভেঙে যে কত দারিদ্র্যের বান ঢুকেছে তার আর হিসেব হয় না। বাল্যবিবাহ সমর্থন করবার আগে যদি ও ব্যাপারগুলোর একটু খোঁজ কোরে দেখতেন তো মিছে তর্কের নিজেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মে উঠত—আর—আর—মিছে তর্ক করেন বোলে নিজের ওপরেও ...'

এক দিকে যেমন 'বাহবা'সূচক ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি কতকগুলা কথার রব উঠিল, অন্যদিকে তেমনি পরাজয়ের উত্তেজনা মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। দলটা ভাঙ ভাঙ করিতেছিল, তর্কের গন্ধ পাইয়া আবার গুছাইয়া বসিল। হারাধনের একে তো প্রথম উত্তরেরই জবাব দেওয়া হয় নাই, তাহাতে আবার এবারের তর্কের শেষ দিকটায় এই খোঁচা, —সে তর্কের আর ধার দিয়াও গেল না, হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—'আরে রেখে দিন আপনাদের ওসব bogus—ইয়ে; আমার সভা-টভায় বিশ্বাস নেই। এতদিন পর্য্যন্ত দুনিয়ার যত দেয়াল বাল্যবিবাহের দোষে ভেঙ্গে পড়েছে, এইবার না হয় আপনাদের গলাবাজির চোটে পোড়বে,—ফল একই ...'

সদাশিব কিসের জন্য একটু ভিতরে গিয়াছিলেন। আট হাতি পাছাপেড়ে ডুরের খর্ব্ব কোঁচাটি দুলাইতে দুলাইতে হুঁকা হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'আবার কি হোল? তোমরা সব নেয়ে খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হোয়ে এস, তর্ক করবার জন্যে তো সমস্ত দিনটাই পোড়ে রোয়েছে ...'

ফেলারাম সমস্ত তর্কের মধ্যে ছাঁকিয়া শুধু এই কথাটি ধীরে ধীরে বলিল—'বিশেষ কিছু হয় নি, আমাদের হারাধন বাবুর সভা-টভায় আর তেমন বিশ্বাস নেই—সেই কথা বোলছিলেন।'—বলিয়া একবার নির্লিপ্ত ভাবে হারাধনের পানে চাহিল এবং পরে স্বপক্ষীয়দের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল।

সদাশিবের ঠিক এই সময়টিতে যোগদান করিতে হয়; কারণ দেখা গেল, হারাধনের মুখে এক খণ্ড কাল মেঘ উঠিয়াছে এবং যে ঝড় উঠিবে তাহাতে ভদ্রোচিত যাহা কিছু সমস্তই উড়াইয়া লইয়া যাইবে।

'খুব ঠিক কথা, শুধু হারাধনের কেন, আমারও তো বিশ্বাস নেই'—বলিয়া তিনি ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া হুঁকায় বড় বড় টান দিতে লাগিলেন।

গজানন, সতীনাথ, গিরিজা, নেপাল, কয়েকজন উৎসাহী প্রবাসী ছাত্র;—যেমন নোয়াখালির রমেন্দ্রচন্দ্র এবং কটকের জগবন্ধু—এককথায় দলের বেশীরভাগই প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চটিয়া উঠিল এবং প্রশ্ন করিল—'যদি বিশ্বাসই নেই তো ঘর ছেড়ে দিতে গেলেন কেন চক্কোত্তী মশায়? হ্যাঁ ...'

—'তোমরা সভা কোরে, সভার কাজ দেখিয়ে আমাদের বিশ্বাস জাগাবে বোলে, আমাদের ঘাড় ধরে বিশ্বাস করাবে বোলে। যতক্ষণ সভাই নেই ততক্ষণ বিশ্বাস আবার কোরব কি হা?'—বলিয়া হারাধনের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন—'কেমন, এই তো হে হারাধন বাবু?—যে যে-ভাবেই কথা বল রে দাদা, চক্কোত্তী মশায় টেনে বের কোরবেই কোরবে।'

উভয় দলেরই মনের কালিমা অনেকটা কাটিয়া গেল

রাগের মাথায় যে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহার এমন সদর্থ হইয়া গেল দেখিয়া হারাধনও হাসিয়া সেটা স্বীকার করিয়া লইল, বলিল,—'অনেকটা তাই; মোট কথাটা কি জানেন চক্কোত্তী মশায়—আপনাদের মত একটা বিচক্ষণ মুরুব্বী লোক থাকলে সভা সমিতিতে থাকতে রাজি আছি, নৈলে শুধু ছ্যাবলামি …'

বার জোড়া চোখের মধ্যে বোধ হয় আট জোড়া চোখ ক্ষুধিতভাবে হারাধনের দিকে চাহিয়া ছিল—তাহার কথাটা থামিলে হয়—

না থামিবার পূর্ব্বেই হারাধন অশ্রুতিপ্রিয় বিদ্রূপে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল—'যা হোক হারাধন একটি মুরুব্বী সঙ্গী পেলে'—'আহা, ভ-ভা-ভাগ্যিস্ রাজি হো—লে হা-হা-রাধন' —'ওঃ, কি মস্ত বড়—বিচক্ষণ লোকটাই না রে আমার!'

কেবলা বলিল—'বলি, ছ্যাব্‌লামি কি রে হেরো—কথাটার মানে জানিস্?' একজন বলিল—'বানান করুন তো দেখি?' আর একজন বলিল—'সন্ধি বিচ্ছেদ …'

সদাশিবের ছোট মেয়েটি বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দোরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াই আবার ভিতরের পানে তাকাইয়া ছোট ভাইকে ডাকিল—'ওরে খেনো, আবার লেগে গেছে—দেখসে …'

সদাশিব তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—'তোর মেয়ের নিকুচি কোরেছে! ভেতরে যাঃ, তামাসা পেয়েছেন …'

আস্তত ছেলেটি দুই হাতের মাঝখানে দুইটি খ্যাংরা কাঠ একত্র করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে—'নালোদ্, নালোদ' করিয়া দিদির যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। ধমক খাইয়া সেও চলিয়া গেলে বাড়ীর বাচ্চা কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া চৌকাঠের উপর পা তুলিয়া দিয়া গলা উঁচাইয়া ব্যাপারটা কি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হারাধনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে চামড়ার জালের হাল-ফ্যাসানের হালকা চটি জোড়াটা টানিতে টানিতে গোঁ হইয়া চলিয়া গেল— কাহারও আহ্বান—এমন কি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হুঁকাটা একবার ঘরে 'রাখিয়া' দিয়া যাইবার অনুরোধটাও গ্রাহ্য করিল না।

সে চলিয়া গেলে হুঁকাটাতে দু'টা টান দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—'নাঃ, এ বড় অন্যায় তোমাদের …'

'কিসে অন্যায়?'—'অন্যায়টা কার?'—'গেঁজুরি কথা এখানে খাটবে না।'—প্রভৃতি কতক প্রশ্ন ও অভিমতের আকারে তর্কটা আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভদ্রলোক আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে তিনি হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা ও সব আবার ঠিক কো'রে নেওয়া যাবে'খন, তোমরা এখন নেয়ে খেয়ে নাওগে … এই যে আসুন মোক্তার মশায়—খবর ভাল তো? …'

(২)

লোকটি আধসেরা-তালা-লাগান ক্যাম্বিসের পেটফোলা একটা ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিল।

লিক্‌লিকে খর্ব্বাকৃতি, অথচ শরীরের অনুপাতে মুখটা এবং মুখের অনুপাতে নাকটা বেজায় বড়—অনেকটা কার্টাইডের বিজ্ঞাপন-চিত্রের মত। খুব ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়। গম্ভীর ভাব হইতে হঠাৎ হাসি এবং হাসির মধ্যে হঠাৎ গাম্ভীর্য্য আনিয়া ফেলিবার লোকটার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে,—আবার হাসিলে, বর্ত্তুল নাসিকাটির উপর একটা টান পড়িয়া ধারাল অগ্রভাগটি ঠোঁটের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাতে তাহাকে আরও বেশী করিয়া ধূর্ত্ত দেখায়। কথা কয় চারিদিকে নজর রাখিয়া, আর উচ্চ গলায় কথা কহিতে কহিতে এক এক যায়গায় আওয়াজ এমন নামাইয়া ফেলে যে, শ্রোতার নিকট বিষয়টির গুরুত্ব চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, হাঁ আলবৎ, মোক্তার বলি তো একেই,—চেহারায় মোক্তারি, চালে মোক্তারি, কথায় মোক্তারি, এমন কি হাসিটিও মোক্তারিতে মাখান! …

লোকটি কিন্তু মোক্তার নয়, ঘটক। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে সে কথাও জানিতেন না এমন নয়, তবে আর কেহ—বিশেষ করিয়া পাড়ার ছেলে ছোকরারা কথাটা জানিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া একটি অষ্টবক্র চেয়ারের

উপর উপবেসন করিলেন এবং সপ্রশ্ন নেত্রে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সে প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া মুখোমুখি হইয়া একটি চৌকির উপর বসিল এবং শুকৃন গালের এক গাল হাসিয়া বলিল—'মোক্তার?—তা খুব এক চাল চেলেছেন ছোঁড়াদের কাছে। বেটারা ঘটক দেখ্‌লে যেন ছিঁড়ে খেতে চায়। বলিহারি বুদ্ধি আপনার ...' হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চাপা গলায়—'তা আমি তো সেই কথায় মেয়ের মাকে বোললুম—বলি, বয়েস যদি হয়েই থাকে একটু, বুদ্ধি কিন্তু এখনও যুবোর মত ধারাল।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গদ্‌গদ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—'তা মোক্তার নয়-ই বা কিসে? প্রজাপতির আদালতে আপনারাই তো ত্রাণকর্ত্তা? সদু চক্কোত্তী কখনও ভুল বলে না। আসল কথা কি জান রে ভায়া?—পাড়ার এই অখণ্ডে বেটারা পাঁচ পাঁচটা সম্বন্ধ ভেঙেচে, তাই আর ঘটক নামটা উচ্চারণ করা সুযুক্তি মনে করি না। এখন চেষ্টায় আছি ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই রস্তা দেখাব। সবার মাথায় ঢুকেচে 'বাল্য বিবাহ-রোধিনী সভা' কোরতে হবে। খুব তাইয়ে দিয়েচি, বোললুম, সে তোমরা আমার ঘরেই কর না কেন ... মহা খুসী; এক কথায় সভাপতি পর্য্যন্ত হয়ে গেলাম।—হ্যাঁ, তা হবু-শাশুড়ী কি বোললেন তাতে?'

'ধুজ্জটী ঘটক যখন আসরে নেমেচে তখন বিয়ের আর বাকি নেই জেনে রাখবেন, দাদা। কথার চোটে একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে এসেচি; মাগী তো আজ হোলে আর কাল চায় না। তবে কি জানেন?—কিছু চায় মোটা রকম; বলে—এই স্যাটাটা চুকিয়ে একেবারে কাশীবাসী হব, ঘটক ঠাকুর। তা কর্ত্তা তো কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, এখন জামাই-ই হবেন আমার ভরসা— বোলে কাঁদতে লাগল ...'

কান্নার নামে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বলিলেন—'আহা, কান্না কেন, চক্রবর্ত্তী কি পেছ্‌পাও কিছুতে?'

ঘটক তাহার নাকটানা হাসি হাসিয়া বলিল—'ঠিক সেই কথাই তো আমিও বললাম তাঁকে, বলি—আপনি সে বিষয়ে কোন ভাবনা রাখবেন না। সদাশিব চক্কোত্তীর বুকের পাটা আছে; বড় কপাল জোরেই এমন জামাই পেয়েছেন আপনি।' ঘটক প্রথমে কন্যার মাকে মাগী বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ভাবী জামাইয়ের দরদ দেখিয়া ঝাঁ করিয়া সুর বদলাইয়া ফেলিল।

'তবে একটা বড় গোল হয়েচে—' বলিয়া সে অতি নিঃশব্দ গতিতে গিয়া ভেজান দুয়ারটা সামান্য খুলিল এবং গলা বাড়াইয়া বাহিরটা তত্ত্বাবধান করিয়া আবার দুয়ারটি ভেজাইয়া চৌকিতে আসিয়া বসিল। গম্ভীর ভাবে বলিল—'ধুজ্জটী ঘটকের সব কাজই এই রকম আটঘাট বেঁধে। আজকাল আর আপনার-আমার যুগ নয় চক্কোত্তী মশায় যে, কথা শুনবো তো বুক ঠুকে সামনে দাঁড়িয়ে; কে জানে দোরের আড়ালে পাড়ার পাঁচ জোড়া কান পাতা রোয়েচে কি না ... কি বলছিলাম—হ্যাঁ এক যায়গায় একটু গোল বেঁধেচে—' চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া—'বেঁধেচে একটু গোল ...'

উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ারটা আরও নিকটে টানিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—'কি, কি, আবার গোল কিসের?'

'ঐ যে বললাম—আর আপনার আমার যুগ নেই, দাদা, যে, বাপ-মা ধোরে বেঁধে কাণা খোঁড়া যা একটা গলায় লটুকে দিলে তাই শিরোধার্য্য।—এখন ছেলে মেয়েদের মধ্যে সব 'লব' ঢুকেচে। সে যুগে একটা বিদ্যেসুন্দর হোয়েছিল তাতেই পুঁথি লেখা হোয়ে গেল, এখন ঘরে ঘরে বিদ্যে-সুন্দরের হুড়োহুড়ি ...'

'আঃ, কি হ'য়েছে বল না ছাই—' চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘটকের মুখের উপর উবুর হইয়া পড়িলেন।

ঘটক গলাটা এত নামাইয়া লইল যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অত কাছে থাকিয়াও শোনা দুষ্কর হইয়া উঠিল। বলিল—'মাগী—ইয়ে, ক'নের মা'র দূর সম্পর্কে এক কুটুম্বের ছেলে—সেই যে বলে না? সইয়ের বউ-এর-বকুল-ফুলের-ভাইপো-বউয়ের-বোনপো-জামাই—সেই গোছের আর কি—তিনি নাকি ঘন ঘন যাওয়া আসা লাগিয়েচেন ...'

'সত্যি নাকি? তা হবু-শাশুড়ীর কি মত?'

'যদি শম্মা না থাকতো তো হবু-শাশুড়ী যে কার হবু-শাশুড়ী হোতেন বলা যায় না—তবে ...'

'কি কোরলেন আপনি ?'

এখানে আর চাপা গলায় কুলাইল না ; অনেকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াই ঘটক বেশ স্পষ্ট গলায় বলিল—'বোললে আত্মশ্লাঘা করা হয় দাদা,—এই ধুজ্জটী ঘটকেরই প্রপিতামহ সিদ্ধু ঘটক একদিন ঘাটের মড়ার হাতে গৌরীদান করিয়েছিল। আজ ধম্মের সে জোরও নেই, কুলীনের সে মর্য্যাদাও নেই। সিদ্ধু ঘটকের সামনে যারা তটস্থ থাকতো, তাদেরই নাতি-নাতকুড়েরা একটু বি-এল-এ ব্লে করতে শিখে আজ আমায় 'সিন্ধু ঘোটকের পৌত্তুর' ব'লে ঠাট্টা করে বাড়ীর দেয়ালে গোবর দিয়ে লিখে দিয়ে যায়। আচ্ছা দিক্, ধম্মের জয় একদিন না একদিন হ'বেই …'

'ধর্ম্মই তো আমাদের ভরসা রে দাদা, তা কি করলে তুমি ?'

'দু'তরফেই একটু ভুজং দিয়ে তো আপাতত ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, এখন আপনার কপাল আর আমার হাত যশ।—ক'নের মাকে বল্লাম—'দেখ ঠাকরুণ, ভাল চাও তো ঐ পীড়িত-টীরিতের হাত থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখো—যত নষ্টের কু ঐ সব। এই কোরে কোরে বয়েস খোয়ালাম, আমার তো জানতে বাকি নেই—কলেজে পড়বার সময় আজকালকার চ্যাংড়াদের ও-একটা ভূত চাপে, ডাক্তারেরা যাকে বলে হিষ্টিরিয়া—তারপর পাশ-টাশ কোরলে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ নিয়ে যখন ঘটক যাওয়া-আসা করে তখন মেজাজ যায় উল্‌টে, তখন কে কার কড়ি ধারে। এই কোরে কোরে কত গেরস্ত ঘরের সব্বনাশ হোয়ে গেল, তা আর ঘরের কোণে বোসে তোমরা কি বুঝবে ? তা ভিন্ন, পীরিত কোরে ছেলের পেট না হয় খানিকটা ভরল, ছেলের বাপ-মায়ের জন্য তো চাঁদির খোরাক চাই—সে তুমি গরীব লোক কোথা থেকে জোগাবে ?—পার জোগাতে, বল না আমিই আজ ঘটকালি কোরছি। তা ভিন্ন, ধর যেন সবই ঠিক হ'য়ে গেল—সাত মণ তেলও পুড়ল, রাধাও নাচল—কিন্তু চক্কোত্তী ঠাকুরের মত ছেলের বাপ তো উল্‌টে তোমার পায়ে টাকা ঢালছেন না যে, নিশ্চিন্দ হোয়ে কাশীবাসী হবে ! তা ভিন্ন—তা ভিন্ন—সে অনেক কথা —এখন আর মনে পোড়ছে না। শেষকালে বোলে এলাম—'না পেত্তয় হয় তোমার, সাত দিনের মধ্যে তোমার কাছে পাঁচশো টাকা আগাম হাজির করছি। সোনার চাঁদ জামাই হ'বে ; মোহে ভুলে হাতের রতন … '

'একেবারে পাঁচ-শো টাকা কো'বলে এলে ?—তা, সে—মাগী কি বল্‌লে ?' টাকার কথাটা তুলিয়া ঘটক খুব সতর্ক ছিলই,—সামলাইয়া লইয়া বলিল—'ভাবী শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ আপনার দরদী মেয়েমানুষ দাদা, বোললেন—'না, সে কি কথা, ঘটক ঠাকুর !—যাঁর হাতে মেয়ে দোব তাঁকে পেত্তয় যাব না !—আর আপনার মত লোক যখন মাঝখানে রয়েছে !—তবে কি জানেন শো-দুয়েক টাকা এখন পেলে—' একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের পানে চকিতে চাহিয়া লইল এবং তাহাতে আবার প্রীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বলিল—'শো-দুয়েক টাকা এখন পেলে বড় উবগার হোত। অমন জামাইয়ের যুগ্যি তো কিছুই করা হবে না, মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে ; তবুও মামুলী বরাভরণ-টরাভরণগুলোর একটু আয়োজন কোরতে হবে তো …'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ; ভাঙা চেয়ার-টাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'আরে সে তুমি দু'শো কেন, আড়াইশোই নিয়ে যাও না—না হয় তিনশোই হোল। তিনি যদি পাঁচশো টাকাই চাই—হুকুম কোরতেন তো কি আর আটকাত ? এখন সবই তো তাঁর মেয়েরই —

ঘটক আনন্দে হেঁ-হেঁ করিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল, এবং হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে টানা নাকের ডগাটা চক্ চক্ করিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন— 'তারপর সেই রসিকরাজ নাগরটিকে কি বললেন ?'

ঘটকের হাসির মাত্রাটা আরও উৎকট রকম বাড়িয়া গেল।—তাহারই মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া বলিল—'দাদা, এত হাসাতেও পারেন—বলেন কিনা—'রসিকরাজ নাগর' ! না দাদা, তুমি এত দুঃখের কথায় আর হাসিও না— পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে—ওঃ—এত হাসাতেও পারেন আপনি—বলেন কি না—'রসিক রা … '

'মোক্তার মশায়, ও-কথাগুলো আদালতে বড় একটা শোনা যায় না ; একটু চেপে—' সঙ্গে সঙ্গে ঘটকের পায়ের বুড়া আঙ্গুলে চটি জুতার একটা টিপুনি দিয়া তাহাকে

থামাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাঁ, তাঁকে কি কোরে ঠাণ্ডা কোরলেন?'

'এঃ, দেকেছ, আবার পা'টা ঠেকে গেল—' বলিয়া ঘটক ঝুঁকিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চটিজুতাটা স্পর্শ করিয়া হাতটা কপালে ঠেকাইল, তাহার পর অভ্যাস মত স্বরটা একেবারে খাদে নামাইয়া কহিল—'আমি কোরলাম, কি বোলতে পারি দাদা?—তাঁর কাজ তিনি কোরে যাচ্ছেন—প্রথমত গিয়ে তার বাপকে ধোরলাম, বোললাম—এমন সোনার চাঁদ ছেলে আপনার—রূপে কাত্তিক, গুণে গণপতি—বাজারে পোড়তে পাবে না; আর সেই ছেলেকে, এমন বিচক্ষণ লোক হোয়ে কিনা ঐ হাঘরে মাগীর জামাই কোরতে যাচ্ছেন!' ... খুব একচোট চড়িয়ে দিলাম আর কি ... 'মেয়ে সুন্দর!—আমি ভার নিচ্চি—হুকুম করুন, ডানা-কাটা পরী এনে হাজির কোচ্ছি—দুদিকে দুটো হীরের ডানা বসিয়ে ... লোকটি বড় নিরীহ; বলে, ঘটক মশায়, সবই বুঝি, তবে অসহায় মেয়েমানুষ, আমাদেরই ঘাড়ে এসে পোড়েছে ...' বোললাম—'আপনি আমার ঘাড়ে ঝেড়ে ফেলুন, আমরা রোয়েছি কি করতে? আগে ও মেয়ের ব্যবস্থা করে' তবে আপনার ছেলের জন্যে লাগবো।—অমন ছেলে, যদি কম-সে-কম হাজার দশেক টাকা সিন্দুকে না উঠল তো আর হোল কি — হাজার খানেক তো আমিই গুণে নোব—কর্‌করে ...' বুড়োর মুখ দিয়ে নাল পড়তে লাগলো দাদা,—যাকে বলে নাল পোড়তে লাগলো। বোললে—'তা হোলে, যদি সামলে নিতে পারেন ঘটক মশায়, তো দেখুন; আমি তো কাল পাকা কথা দিই নি;—বলেছি 'যদি ওখানে না হয় তো আমার ছেলে দোব ...'

ঘটক, কি রূপ প্রভাবটা হইতেছে লক্ষ্য করিবার জন্য একটু থামিল, তাহার পর উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল—'তারপর গেলুম খোঁজে সেই ছোকরার কাছে। প্রথমত সেই সইয়ের-বউয়ের-বকুল-ফুলের সম্বন্ধটা ধোরে বললাম—'বাবাজি তোমার গিয়ে 'লব্' জিনিষটা ভাল, কিন্তু তোমাদের যে সম্বন্ধে আটকাচ্ছে তার খোঁজ রাখ? তোমরা তো বেদ বেদান্ত ঘটক পুরুত কিছুই মান না, তা বলে কি বোনের সঙ্গে বিয়ে কোরতে হবে? তবে ম্লেচ্ছোরা আর কি দোষ কোরেছে? শুনে চুপ কোরে একটু হাসলে। দেখলাম, ওষুধ ধোরেচে। একটু মিথ্যে কথা জুড়ে দিলাম—ধর্ম্মের জন্যে সবই করতে হয় দাদা; বোললাম—'আর এক কথা, বাবাজি, তোমরা ছেলেমানুষ, অত মারপ্যাঁচ বোঝ না;—মাগী যে এদিকে আমার পাত্তোরের কাছে হাজার টাকা খেয়ে দলিল পত্তর কোরে বোসে আছে। কুটুম্বের ছেলে, এক গ্রামে থাকো তাতে আবার ... কাজেই চক্ষু লজ্জার খাতিরে কিছু বোলতে পারছে না। তুমি যখন মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে পোড়বে সেই সময় ভরা ডুবি কোরবে' ... কে হ্যা, দোর ঠেলো? একটু অপেক্ষা কোরতে হোচ্চে,—চক্কোত্তী মশায় বিশেষ ব্যস্ত ... ও, আপনার সেই বাচ্চা কুকুরটা; ব্যাটা সব্বঘটে আছে ...' উঠিয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া—'কি বোলছিলাম?—হ্যাঁ — সেই সময় ভরাডুবি করবে, মহা জাঁহাবাজ মাগী' ... শুনে ত বাছার মুখটি এতটুকু হোয়ে গেল। বলে—'ঘটক মশায়, ওর মনে যে এত আছে কে জানে বলুন—আর তা হোলে ও বাড়ীর ছায়া মাড়ান নয়' ... মনে মনে বোললাম—'পথে এস বাছাধন; এ ধুর্জ্জটী ঘটক, হুঁ ...'

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হঠাৎ চমক ভাঙিল—'ওরে তামাক দিয়ে যা না রে; দেখেছ, কারুর কি আর চাড় আছে বাড়ীতে ভায়া?—সাধ কোরে কি আবার একটি 'সংসার' আনতে চাই? ...'

ঘটক শশব্যস্তে বলিল—'থাক্ থাক্, কিসের এত তাড়াতাড়ি দাদা, না—না, আপনি অত ব্যস্ত হোয়ে আমায় অপরাধী কোরবেন না। আমার প্রতিজ্ঞা যে যতদিন না দিদি ঠাকরুণকে এ ঘরের লক্ষ্মী করে আনতে পারছি ততদিন পান তামাকের নাম গন্ধ নয়। নৈলে আমি কি চেয়ে নিতে পারতাম না—এ কি আমার পরের বাড়ী? ...'

এমন সময় দরজায় কয়েকটা আঘাতের শব্দ শোনা গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘটকের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিলেন—'স্রেফ্ মোক্তার মশায়, ফিসের টাকা, আর বাকি খাজনার মোকদ্দমা; আর অন্য কথা নয়, বুঝ্‌লে তো? ...'

ঘটক চতুর বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে

লঘুভাবে একটি ধাক্কা দিয়া সহজ গলায় বলিল—'আসল কথা, হাকিম হোয়েছে অবুঝ—আইন কানুনের ধার দিয়ে যায় না—কাজেই ...'

(৩)

যে ছোকরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'মুখের গ্রাসটি' নিজের উদরসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে তাহার নাম মহীতোষ। হুগলী কলেজে পড়ে, সামনের বছরে বি, এ দিবে। তবে 'লব'-এর তাড়নায় সে যেরূপ সুস্থশরীরে ঘন ঘন 'সিক্ লিভ্' লইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে কাহারও ভরসা নাই যে, সে ভালয় ভালয় পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

ঘটক যখন চোখে আঙুল দিয়া তাহার ভুলটা দেখাইয়া বিদায় লইল, মহীতোষ কামিজটা গায়ে দিল, কাবুলী-চটিটা বক্‌লস্ কষিয়া পায়ে আঁটিল এবং গালে একটা পান পুরিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিকালবেলা; কিন্তু আজকাল কি জানি কেন—শরীরটা তেমন ভাল থাকে না বলিয়া আর বেড়াইতে যায় না। ও-পাড়ায় গিয়া তাহার এক অনিশ্চিত-সম্পর্কের ছোট মাসতুত ভাইকে পড়ায়, এই সময়টায় মনটা তাতে নাকি তাহার ভাল থাকে। ছেলেটির নাম নবকুমার, সাত আট বছর বয়স, দিব্য ফুটফুটে! বেচারার বাপ সম্প্রতি মারা গিয়াছে, এখন আছে মা আর একটি বোন। আগে ইহারা অন্য কোথায় থাকিত; এ গ্রামে সম্প্রতি আসিয়াছে।

নবকুমার বাড়ীর বাহিরে খেলা করিতেছিল। মহীতোষকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহার বাম হস্তটা দু'হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—'মাসীমা কোথায় রে নবু?'

'মা ওপরের ঘরে, আর দিদি ...'

মহীতোষ চোখ রাঙাইয়া বলিল—'তোর দিদির জন্যে আমার যত মাথাব্যথা পোড়েছে!'

নবকুমার ঠিক অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না; একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—'দিদিরও মাথা ব্যথা কোরেছে মহীদা—' সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের ঘাড়টা নামাইয়া কানে কানে বলিল—'কিন্তু মিছে কথা মহীদা, আমাকে বোললে, মহীদা যদি ডাকে তো বলিস্ দিদির মাথা ব্যথা কোরেছে ...'

মহীতোষকে হাসিতে দেখিয়া নবকুমার সাহস ফিরিয়া পাইল, কহিল—'হ্যাঁ মহীদা, দিদির নাকি বুড়ো বর আসবে? মা কাঁদছিলেন ...'

'তোর দিদি এত মিথ্যেবাদী হোয়েছে, বুড়ো বর হবে না?'

কথা কহিতে কহিতে তাহারা ভিতরে আসিয়া পড়িল। নবকুমারের বোন নিশ্চিন্ত মনে রোয়াকের ধারে পায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটি দুলাইয়া দুলাইয়া, নাকমুখ সিঁটকাইয়া, চোখ বুঝিয়া টোকো আমের সদ্গতি করিতেছিল—সে এমনই মনোযোগের সহিত যে, ইহাদের আগমন টেরই পাইল না। যতক্ষণ চোখ বোজা রহিল মহীতোষ দাঁড়াইয়া দেখিল; খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিল—'মাথা ব্যথার চমৎকার ওষুধ হোচ্ছে ...'

নবকুমার উল্লাসে হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুড়দুড় করিয়া গিয়া কোণের ঘরে আশ্রয় লইল। বাম হস্ত হইতে চার পাঁচখানি আমের কুঁচি আর খানিকটা লবন রোয়াকের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

ছাতের উপর থেকে নবকুমারের মা মহীতোষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। মেয়েকে ডাক দিয়া বলিলেন—'উমা, তোর দাদাকে একখানা আসন দিয়ে যা।'

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—'আজ সেই ঘটক এসেছিল, মাসীমা?—কি সব বোললেন আপনি?'

'যে রকম বোলতে বোলেছিলে সেই রকমই বোললাম বাবা।—হ্যাঁ ভাল কথা—আজ ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। তোমার কথামত তোমার বাবার নাম করে বোললাম যে, তিনি একবার দেখে না এলে চলে না,—খুব শক্ত হোয়ে রইলাম। প্রথম তো দিতেই চায় না, বলে—আমি তাঁকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব,—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, অত কি বাড়ীর নম্বর টম্বর মনে রাখতে পারি? ... তাতে আমি একটু বেঁকে দাঁড়ালাম তখন কাঁচুমাচু কোরে ঠিকানাটা

দিলে ;—তাও কেমন, তোমাকে দেখাতে মানা—কালেজের ছেলেদের নাকি বড়দের বিয়ে পণ্ড করা আজকাল একটা বাতিক হোয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসিও পেল, দুঃখও হোল—হ্যাঁগা, তোমরাই সব কোরছ কম্মাচ্ছ আর তোমরাই বাগড়া দেবে।… যাও তো নবু, দেরাজ থেকে ঘটকের সেই কাগজটা নিয়ে এস তো। একটু খোঁজ নাও বাবা, তলে তলে, আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লেগে আছে। তোমরা বোলছ বটে, কিন্তু … '

'কিন্তু জানেন মাসীমা, হাতের সম্বন্ধটা পায়ে ঠেলা কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও চেষ্টা কোরতে হবে, যেখানে লেগে যায়। আজকাল যেমন দিনক্ষণ পোড়েছে … '

দুয়ারের পাশে আঁচলের খানিকটা রাঙাপাড় দুলিতে দেখিয়া আঁচলের মালিকটিকে শুনাইবার জন্য বলিল,—'আজকাল যেমন দিনক্ষণ পোড়েছে, শুধু সুন্দর হোলেই তো চলে না … '

আঁচলটি সবেগে অন্তর্হিত হইল। মহীতোষ হাসিয়া বলিল—'আমি আর আজকাল আসনটাসন পাই না মাসীমা?'

'না বাছা, আমি এ-মেয়ের আদি-অন্ত পাই না। তের-বছরের ধাড়ী, কবে আক্কেল হবে!'—বলিয়া নিজেই আসন আনিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় ছুঁড়িয়া-ফেলা একটা মাদুর রোয়াকের উপর আসিয়া পড়িল। মহীতোষ দরজার দিকে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আসনটা পাতিয়া বসিল।

মাসীমা রাগত ভাবে বলিলেন—'দেখলে একবার দেওয়ার ছিরিটা—আজ বাদে কাল যাকে পরের ঘর কোরতে হবে …'

অদৃশ্য শ্রোত্রীটিকে আর একটি খোঁচা দিয়া মহীতোষ বলিল—'বিশেষ কোরে বুড়ো লোক, সে আবার বেশী খুঁৎখুঁতে হবে। কৈ নবু, তোমার বই নিয়ে এলে না এখনো?'

মাসীমা কাজ ফেলিয়া আসিয়া ছিলেন, উঠিয়া গেলেন। নবকুমার বই-এর জন্য দিদিকে হাঁক দিল। সে-ই তাহার বই-শ্লেট আজকাল গুছাইয়া রাখে, আবার পড়িবার সময় বাহির করিয়া দিয়া যায়। প্রথমে এগুলো নবকুমারের নিজের কাছেই থাকিত ; মহীতোষ আসিয়া এই নূতন বন্দোবস্তটি জারি করিয়াছে—বলে ইহাতে প্রথমত এই ছিঁড়িবার ভয় কম, আর দ্বিতীয়ত উমারও জিনিষপত্র গুছাইবার একটা অভ্যাস হইতে থাকিবে।

প্রথম প্রথম উমা বলিয়াছিল—'এ সব মহীদার দুষ্টুমি ; —তা বেশ, আমায়ও বোকা মেয়ে পান নি। … দেখ নবু, তুমি রোজ বই-শ্লেট আমার কাছ থেকে নিজে এসে নিয়ে যাবে, আবার আমার হাতে দিয়ে যাবে। আমি মহীদার কাছে গিয়ে দিয়ে আসতে পারব না ; আমার এককথা।

এই 'এককথা'মত কাজ মাত্র দুই একদিন চলিল। তাহার পর কিন্তু সে নিজেই পুস্তক-বাহিকার পাট উঠাইয়া লইল। ক্রমে 'অনেক কাজ' থাকিলেও সে নেহাৎ বই-শ্লেট দিয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল না। তাহার পর মহীতোষের প্রশ্নে এরূপও উত্তর হইতে লাগিল যে—'আজ আর তেমন কাজ নেই' অথবা 'আজ সকাল সকাল সব সেরে এসেচি মহীদা, নবু পড়ুক, তুমি কলকাতার একটা গল্প বল …'

এমন কি শেষে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালিকাটি কি ভাবিয়া একদিন এ কথাও বলিয়া বসিল—'শুনছ নবু?—তোমার আর দয়া করে নিজে গিয়ে বইটই তুলে আনতে হবে না ; আমিই এসে নিয়ে যাব 'খন।—এইটুকু নিয়ে যেতেই তুমি ছিঁড়ে-খুঁড়ে একেক্কার কোরে ফেল …'

কিন্তু আজ সে আর সামনে আসিল না, নবকুমারকেও ডাকিয়া কেতাব-শ্লেট গছাইয়া দিল না ; নববধূর মত দুয়ারের আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া সেগুলা রোয়াকের উপর রাখিয়া সামনে ঠেলিয়া দিল।

নবকুমার ভগ্নীর সঙ্কোচ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বই-শ্লেট উঠাইয়া আনিল। এবং বইয়ের পাতা খুলিতে খুলিতে হঠাৎ মহীতোষের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'মহীদা, দিদির কথা শুনেছ?—'

দুয়ারের দিকে চাহিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল। মহীতোষ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া অভয় দিয়া বলিল—'কিরে নবু? আমার কাছে ভয় নেই, বল্।'

উমা চোখে রাগের বিদ্যুৎ হানিয়া, একবার দুয়ারের পাশ

হইতে মুখটা বাড়াইয়া দৌড়াইয়া উপর তলায় চলিয়া গেল। সেখান হইতে হাঁক দিল—'নবু, তোমায় মা ডাকচেন, শিগ্‌গির্ শুনে যাও সে।'

নবকুমার মহীতোষের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কহিল—'বড় চালাক হোয়েছেন; মা কলসী নিয়ে ঘাটে গেলেন আমরা যেন দেখি নি। কি বোলছিল দিদি জানো মহীদা? বোলছিল—'বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হোলে, ভাই, আমি আপিন খেয়ে মরব,—মাও জব্দ হবে, মহীদাও ...'

মহীতোষ মনের আগ্রহ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল—'তাই নাকি?—তা হোলে কাকে বিয়ে কোরবে বোললে?

নবকুমার চুপ করিয়া রহিল; মহীতোষের নিকট তাগাদা খাইয়া তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিল—'না, বোকবে।'

মহীতোষ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'না বোকব না, তোকে একটা রেলগাড়ী কিনে দোব, বল্।'

মুখটা কোলে আরও চাপিয়া নবকুমার বলিল—'তোমায়; ভারি অসভ্য দিদি, দাদাকে কখন কেউ বিয়ে করে?'

মহীতোষ নবকুমারের মাথাটার উপর হাত চাপিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিল; তাহার পর তাহার গালে একটা আদরের ছোট্ট আঘাত দিয়া বলিল—'কি কথাটা বোললে রে নবু, সমস্ত কথাটা কি?'

নবকুমার মহীদার কড়া চোখ এবং গম্ভীর মুখ কল্পনা করিয়া ভয়ে ঘামিয়া উঠিতেছিল, মুখও বাহির করিল না, এ কথার উত্তর দিতেও সাহস করিল না।

মহীতোষ আবার সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল—'তুই ভারি দুষ্টু হোয়েছিস নবু, দিদির সব কথা বলেছিস্।'

এ তেমন ভয়ের কথা নয়;—নবকুমার কোল হইতে মুখ তুলিয়া মহীদার মুখের দিকে সঙ্কুচিত ভাবে চাহিল, আত্মরক্ষার ব্যাপারটা পাকা করিয়া লইবার জন্য আর একটা কথা বলিয়া দিল—'দিদি আমায় বলে—'তুই কার দলে রে নবু, মহীদার না আমার? ...'

মহীতোষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'ও বাবা, এর মধ্যে আবার দলাদলিও আছে! তা তুই কি বোললি?'

উপর হইতে অনুযোগ আসিল—'নবু, কথা শোন না কেন?—মা যে ডাকলেন।'

মহীতোষ বলিল—'দাঁড়া নবু, একটা মজা করি; বল্ 'আসছি।'

নবকুমার উত্তর করিল—'যাচ্ছি দাঁড়াও'—বলিয়া সকৌতুকে মহীতোষের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

'তুই বোস্। ও ভাববে তুই যাচ্ছিস্—আর সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি।

নবকুমার আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—'হা-হা-হা, তাহোলে খুব জব্দ হবে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ...'

মহীতোষ খালি পায়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া—যে ঘরে উমা ছিল সেই ঘরের কাছাকাছি পহুঁছিতেই উমা পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিল—'এই বুঝি তোমার দিদিকে ভালবাসা, দুষ্টু ছেলে!—আর কক্ষণও—কক্ষণোও—কক্ষণোও ...'

মহীতোষ হাসিতে হাসিতে চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইল। উমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; প্রথমে বিস্ময়ে এবং পর মুহূর্ত্তেই লজ্জায় অভিভূত হইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বালিসের উপর উপুর হইয়া পড়িল।

মহীতোষ বলিল—'নবু আমায় সব কথা বোলে দিয়েছে,—সে আমারই দলে।'

উমার শরীরটা লজ্জায় অধিকতর কাঁপিয়া উঠিল।

মহীতোষ আবার কহিল—'আবার মিছে কথাও শিখেচ খুব;—কৈ মাসীমা?

দেহলতাটি আবার দুলিয়া উঠিল। তাহার উপর আরও একটি দোল দিয়া মহীতোষ বলিল—'তাহোলে আমার সম্বন্ধে নবুর কাছে যা' বোলেচ তাই বা বিশ্বাস করি কি কোরে?

ইহার পর ছোকরা বিনা বাক্যব্যয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সে যে ঠিক এই কয়টি কথা বলিয়া কৌতুক জমাইতে আসিয়াছিল তাহা নয়—আরও বিশেষ একটা কথা বলিবার ছিল; কিন্তু তাড়াতাড়িতে ঠিক পছন্দমত ভাষাও জুগাইয়া উঠিতেছিল না এবং কি রূপ স্বরে কথাটা

বলিলে নিতান্ত থিয়েটারি কিম্বা অত্যন্ত খেলো না হইয়া বেশ মানান-সই হইবে তাহাও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে, সম্ভবত মনে মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া যেই চৌকাঠ ছাড়িয়া দুই পা অগ্রসর হইবে, পিছন হইতে নবকুমার হাতগুলি দিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'খুব জব্দ হইয়াছে দিদি, কেমন মজা …'

মহীতোষ চমকিয়া উঠিয়া হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এমন সময় নিম্নতল হইতে কর্ত্রী ডাকিয়া উঠিলেন—'কৈ রে, কোথায় গেলি তোরা? মহীতোষ এক্ষুণি চোলে গেল?—কেন রে উমা?'

নবকুমারকে আগে করিয়া মহীতোষ একটু অপ্রতিভ ভাবে জড়সর হইয়া নামিয়া আসিল। নবকুমার নিজের স্বভাবগত উল্লাসে মাকে জানাইয়া দিল—'আজ মহীদা দিদিকে খুব জব্দ কোরেছেন মা, আরও কোরতেন …'

'সত্যি নাকি?'—বলিয়া মা একটু হাসিলেন; আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। যুবকটি কিন্তু অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ভাবিল—'আচ্ছা ছেলে তো, পেটে যদি একটা কথা রাখতে পারে!' প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বলিল—'নাও, শীগ্‌গির পোড়ে নাও যে রকম গুমোট করেছে, বোধ হয় ঝড় উঠবে।'

(৪)

পাকে প্রকারে মনের কথাটা বাড়ীতে রটাইয়া দিল। বাড়ীতে কথাটা লইয়া আলোচনা চলিতেই ছিল, একটু বাড়িয়া গেল। কর্ত্তা এবং গিন্নিতে খানিকটা মনোমালিন্য চলিল; অবশেষে কর্ত্তা কলিকালের দারাপুত্র সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হইয়া পর্য্যন্ত রাজি হইলেন যে, যদি কলিকাতার সম্বন্ধটা নষ্ট হইয়া যায় তো নিজের ছেলের সঙ্গেই বিবাহ দিবেন। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন—'ও সব ছলের কথা বুঝি না, সে হাবাতে বুড়ো না মো'লে তো সম্বন্ধ ভাঙ্গবে না।

মহীতোষ কথাটা শুনিল, শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিল।

এদিকে 'সভা' অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে গোটা সাতেক বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গোটা দুই তিন বেশ জোরাল জোরাল মন্তব্য পাশ হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও দেশের অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান সভাসমিতিতে সেগুলির কাপি নিয়মিতরূপে পাঠান হইয়াছে। একটা মন্তব্যে অনেক বাকবিতণ্ডার পর বিবাহে বরের বয়স বাইশ এবং বধূর বয়স পনের এইরূপ ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমরণ সভাপতি। সভাটিকে পুষ্পের সহিত তুলনা করা না গেলেও বাহির হইতেও ভ্রমরের মতই নূতন সভ্য আকৃষ্ট হইতেছে মন্দ নয়। খাতার মধ্যে সকলের শেষে নাম দেখা যাইতেছে মহীতোষ রায়ের।—কোন এক মফঃস্বল কলেজে পড়িত, সম্প্রতি সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সভাটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। অল্প দিন আসিলেও সে খুব উৎসাহী সভ্য বলিয়া ইহার মধ্যেই নাম কিনিয়াছে।—সে না কি বাল্যবিবাহ রোধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায় না—দশের, বিশ্বমানবের এবং সমাজের হিতার্থে বিবাহ নামক জঞ্জালটাই উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প আঁটিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর অগাধ শ্রদ্ধা, সভায় দাঁড়াইয়া এক দিন বলিল—'এ ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সারথী পেয়েছি—আর কিসের ভয়!—পরশুরাম আবার তাঁহার কুঠার উঠাইয়াছেন—পৃথিবী নির্বিবাহ হবে—আর কিসের বিলম্ব!! শিবজটাবিহারিণী ভাগীরথী আজ দুর্ব্বার বেগে ধরণীতে অবতীর্ণা হোয়েছেন—তবে আর কেন এ নৈরাশ্য!!! উঠ ভাই, এস দেখি একবার একমন একপ্রাণ হোয়ে …' এই রকম গোছের আরও সব কথা।

ওদিকে সারথী, পরশুরাম এবং শিবজটাবাহিনী ভাগীরথী-রূপ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর সর্ব্বদা খালি গায়ে আটহাতি ডুরেটি পরিয়া থাকেন না। বেশভূষায় সভায় সভাপতির মর্য্যাদানুরূপ কাপড়-চোপড় তো পরিয়া বসেনই তাহা ভিন্ন সাধারণতও বেশ মিহি থান কাপড় এবং আধুনিক ধরণের সৌখীন ফতুয়া পরিতেই দেখা যায়। ক্বচিৎ এক এক দিন থানের জায়গায় কালোপেড়ে শান্তিপুরীরও আবির্ভাব হয়; কেহ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেয় তো অমনি তাড়াতাড়ি

বলিয়া উঠেন—'দেখেছ ? আর বয়সও নেই, চোখের জোরও কমে এসেছে, কি পোরতে কি পোরে আসি বুঝতেও পারি না।—চল্লিশ প্রায় হোয়ে এল আর কি বলতে চাও ? …'

এইরূপ দৃষ্টিহীনতার সুযোগ পাইয়া এক এক দিন বেলেঘাটার ফিন্‌ফিনে গেঞ্জিও গায়ে উঠিয়া বসিয়া থাকে।—'গুছিয়ে সুছিয়ে রাখবার লোকও নেই, কোথাকার জিনিষ কোথায় পো'ড়ে থাকে, সংসারটা যেন ছারেখারে যাচ্ছে।

এক একজন বলে—'সে তো তোমারই দোষ ঠাকুদ্দা, কোথায় একটি গোছাল দেখে টুকটুকে ঠানদিদি আনবে, তা নয়—'

কেহ কেহ উত্তর দেয়,—'আরে দাঁড়াও, হবু-ঠান্‌দিদির তপস্যা শেষ হোক ; এখনও আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কোরতে হবে—ঠাকুদ্দাকে লাভ করা চাড্ডিখানি কথা কি না !'

এই সব নাতিসম্পর্কীয়দের চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া বলেন—'হাঃ হাঃ, এখন তাঁরা কি আর ঠানদিদি হোয়ে আসতে চাইবেন রে দাদা ? যদি নাতবৌ হোয়ে এসে তোমাদের ঠাকুদ্দার ঘরকন্না মেহেরবানি কোরে একটু কোরে দেন তো সেই ঢের !'

তাহা হইলেও সমিতির কয়েকজন অবিশ্বাসীর মধ্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিবর্ত্তন লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিয়াছে। তাহারা নাকি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে ভিতরে ভিতরে যখন বিবাহের কথা কোনখানে পাকা হইয়া আসিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাপড় আট হাতি ডুরে হইতে ক্রমে শান্তিপুরেয় দাঁড়ায় এবং উগ্রগন্ধ তামাক ও খেলো হুঁকার জায়গাটা ক্রমে রবারের নলওয়ালা গুড়গুড়িটা মাথায় ফৌজদারী বালাখানার সৌরভ বহন করিয়া অধিকার করিয়া বসে। হঠাৎ মাথা ব্যথাটা বাড়িয়া যায় এবং ফুলেল তেলের গন্ধ উড়িতে থাকে ; এমন কি মাঝে মাঝে কাঁচা পাকা চুল ঠেলিয়া একটা লম্বা টেড়ী পর্য্যন্ত মাথার মাঝামাঝি রাস্তা করিয়া লয়,—কোন এক কবিরাজ বলিয়াছে ইহাতে নাকি ব্রহ্মতল পর্য্যন্ত হাওয়া পহুঁছিবার বিশেষ সুবিধা। পরে যেমন যেমন বিবাহের সম্ভাবনাটা কমিয়া আসে, এই সবও নাকি সেই অনুযায়ী তিরোহিত হইতে থাকে এবং অবশেষে আবার সেই সাবেক চাল আসিয়া দাঁড়ায়। বলিলে শুনিবে কেন—এ ব্যাপার তাহারা আজ এই ঝাড়া পাঁচ বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে—ইহার মধ্যে ছয় ছয়টা বিবাহের সম্বন্ধ এল গেল—তাহারা কি চক্ষু বুজিয়া ছিল ?

বেশীর ভাগই কিন্তু অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত সভার কাজে মাতিয়া গিয়াছিল—কথাটাকে মোটেই আমল দিল না, বলিল—'ওদের একটা কিছু না পাকালে আর চলচে না, নুইসেন্স্ !'

মহীতোষও তাহাই বলিল, বরং দুইটা ইংরাজি গাল বেশী করিয়া দিল। কয়েক দিন পরে কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপন করিল—এই সভা নির্দ্ধারিত করিতেছে যে, সমস্ত বিবাহে বর এবং বধূর বয়সের অনুপাতটা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে—অর্থাৎ পনের এবং বাইশের মধ্যে সাত বৎসরের প্রভেদটা সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকা চাই—যদি কোন বর পঞ্চাশ বৎসরে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে তাঁহার তিয়াল্লিশ বৎসরের বধূ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

প্রস্তাবটি গুরুতর বিধায় এবং সেদিন কথায় কথায় ময়াল সাপ কত বড় হইতে পারে সেই লইয়া প্রচণ্ড তর্ক হওয়ার পর আর সময় ও উৎসাহ না থাকায় সেটিকে পরের বৈঠকের জন্য তুলিয়া রাখা হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েক জন উৎসাহীকে এক এক করিয়া বলিয়াছেন—'ও হে, তোমরা না দেখে শুনে যত অজ্ঞাত-কুলশীলদের এনে জোটাচ্ছ, একটু বুঝে চোলো।—কয়েক জন আবার তোমাদের উৎসাহকেও যে টেক্কা দিয়ে চোলেছেন ; কি জান রে দাদা ?—মা'র চেয়ে যার দরদ বেশী—হেঁ—হেঁ—'

এদিকে ঘটক মহাশয়কে বলিয়াছেন—'না ভায়া, কাজ নেই ওখানে ; বেটা ঢুকে অবধি বাগড়া দিতে আরম্ভ কোরেছে, শুধু ওপরে ওপরেই যত ভক্তি। বলি হাঁহে, ঘটকালি ক'রে তো চুলে পাক ধরালে,—তিয়াল্লিশ বছরের ক'নের কথা শুনেচ এ পর্য্যন্ত ? তুমি অন্যত্র দেখ, আর না হয় খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পার তো সে এক কথা। … না হে না, একেবারে অসম্ভব, তুমি এ পাড়ার ছোঁড়াদের চেন